হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ
Hygiene & Public Health
(Community Medicine)

ডি.এইচ.এম.এস

দ্বিতীয় বর্ষ

ডাঃ জে. এম. নুরুল হক

বি.এইচ.এম.এস (ঢাঃ বিঃ)

এম. এসসি ইন মাইক্রোবায়োলজি (প্রা.এ.ইউ)

১। স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝ ? ২০

স্বাস্থ্য এর সংজ্ঞা ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, Health বা স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি অবস্থা, কেবল রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ১৯৪৮ ঘোষিত সংজ্ঞা হল, "স্বাস্থ্য বলতে সম্পূর্ণ শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা বা কল্যাণবোধকে বোঝায়। শুধু রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতিকেই স্বাস্থ্য বলেনা।"

সম্প্রতি গবেষকরা স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা অন্যভাবে দিয়ে থাকেন, "স্বাস্থ্য হচ্ছে নতুন নতুন বাধা এবং দুর্বলতার সাথে খাপ খাইয়ে সুস্থভাবে জীবন-যাপন করা।"

২। জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ির কমপ্লিকেশন ও কন্ট্রাইন্ডিকেশনসমূহ লিখ। ২০

জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ির কমপ্লিকেশন ঃ

(i) উচ্চ রক্তচাপ, (ii) ভেনাস থ্রম্বোএম্বলিজম,
(iii) কলেস্টেটিক জন্ডিস, (iv) করোনারি হার্ট ডিজিজ,
(v) এথারোস্ক্লেরোসিস, (vi) পিত্তথলিতে পাথর হওয়া,
(vii) বমি বমি ভাব, (viii) ওজন বেড়ে যাওয়া,
(ix) স্তনে ব্যথা হওয়া, (x) ব্রণ হওয়া (xi) হাইপারমেনোরিয়া,
(xii) যৌন চাহিদা কমে যাওয়া, (xiii) লিউকোরিয়া (সাদা স্রাব)।

জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবার বড়ির কন্ট্রাইন্ডিকেশনসমূহ ঃ

(i) আর্টারিয়াল বা ভেনাস থ্রম্বোসিস,
(ii) সিভিয়ার হাইপারটেনশন- উচ্চরক্ত চাপযুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে।
(iii) পূর্বে স্ট্রোক হয়ে থাকলে,
(iv) হৃদরোগ থাকলে বা ভালভুলার হার্ট ডিজিজ থাকলে,

(v) ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ থাকলে,
(vi) ডায়াবেটিস রোগ থাকলে বা ডায়াবেটিস উইথ ভাস্কুলার কমপ্লিকেশন।
(vii) মাইগ্রেইন উইথ ফোকাল নিউরোলজিকেল সিম্পটমস,
(viii) একটিভ লিভার ডিজিজ,
(ix) চল্লিশের উপরে বয়স, (x) ৩৫ বয়সের নীচে ধূমপায়ী,
(xi) পূর্বে জন্ডিস হয়ে থাকলে, (xii) হাইপারলিপিডেমিয়া ইত্যাদি।

৩। পানিবাহিত পাঁচটি রোগ, জীবাণু নামসহ লিখ। ২০

পানিবাহিত পাঁচটি রোগের নাম জীবাণুর নামসহ ঃ

(i) ডায়রিয়া- সালমোনেলা (Salmonella), শিগেলা (Shigella flexneri), ব্যাসিলাস (Bacillus cereus), ইশ্চেরিচিয়া কোলাই (Escherichia coli),
(ii) ডিসেন্ট্রি- এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা (Entamoeba histolytica) কিংবা শিগেলা (Shigella) গণভুক্ত ব্যাকটেরিয়া,
(iii) টাইফয়েড ও প্যারা টাইফয়েড- সালমোনিলা টাইফি ও প্যারা টাইফি, (iv) হেপাটাইটিস- হেপাটাইটিস বি ভাইরাস,
(v) কলেরা- ভিব্রিও কলেরি (Vibrio)।

৪। টিকা/ সংক্ষেপে লিখ- যোগাযোগে বাধা

যোগাযোগের বাধা (Barriers of communication) ঃ

যোগাযোগ বাধা হল এমন কিছু যা বার্তা গ্রহণ এবং বোঝার পথে আসে যা একজন তার ধারণা, চিন্তাভাবনা বা অন্য কোন ধরণের তথ্য জানাতে অন্যকে পাঠায়। কার্যকর যোগাযোগের পথে অসংখ্য বাধা রয়েছে যা পথে আসতে পারে। এটি যোগাযোগ বিনিময় সময় বিকৃত পেতে পারেন. যোগাযোগ প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে এই বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ বাধা আসতে পারে। এটি কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান পক্ষপাত বা স্টেরিওটাইপিং এবং সাধারণীকরণের কারণে আসতে

পারে। শিক্ষাবিদ এবং সম্প্রদায়ের (কমিউনিটি) মধ্যে যোগাযোগের বাধার কারণে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রায়শই ব্যর্থ হতে পারে।এগুলো হতে পারে-
১। শারীরবৃত্তীয় (ফিজিওলজিক্যাল) বাধা- উদাহরণ- শ্রবণে অসুবিধা, দৃষ্টিহ্রাস, মানসিক প্রতিবন্ধকতা।
২। মানসিক- উদাহরণ- মানসিক অশান্তি, উদ্বেগ, চাপ, নিউরোসিস সাইকোনিউরোসিস, বুদ্ধিমত্তা, ভাষা বা বোঝার অসুবিধার মাত্রা।
৩। পরিবেশের বাধা ঃ- উদাহরণ-গোলমাল, অদৃশ্যতা, যানজট
৪। সাংস্কৃতিক বাধা ঃ উদাহরণ- নিরক্ষরতা, কাস্টমস, বিশ্বাস, ধর্ম মনোভাব, জ্ঞান এবং বোঝার স্তর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীগত পার্থক্য, ভাষার ভিন্নতা, সাংস্কৃতিক অসুবিধা। কার্যকর যোগাযোগ অর্জনের জন্য বাধা চিহ্নিত করা এবং অপসারণ করা উচিত।

৫। সংক্ষেপে লিখ ঃ- ইউনিসেফ

ইউনিসেফ (UNICEF) ঃ এটি জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম সংস্থা। এটি ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউনিসেফ পূর্ণনাম- ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন ইমার্জেন্সি ফান্ড। UNICEF (United Nations International Children Emergency Fund)। এটির সদর দপ্তর (হেডকোয়াটার)- ইউএসএ এর নিউ ইয়র্ক শহরে এবং আঞ্চলিক সদর দপ্তর- নিউ দিল্লী (ভারত) এ অবস্থিত।

৬। স্বাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ লিখ। ২০

স্বাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO-র স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়ক কমিটির মতে- স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা তার মাধ্যমে দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে পরিবার, সমাজ তথা দেশের সেবা করা। স্বাস্থ্য শিক্ষার সাধারণত তিনটি মূল উদ্দেশ্য করা যায়। যথা-১। মনুষকে তথ্য জ্ঞাপন করা। ২। মানুষকে প্রেরণা দান করা। ৩। কাজ করার জন্য পথপ্রদর্শন করা।

অনেকেই এই উদ্দেশ্যগুলিকে আবার অন্যভাবে ব্যক্ত করেছেন, যেমন- ক) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞানের বিকাশ। খ) অনুমোদনযোগ্য স্বাস্থ্যগত মনোভাবের বিকাশ। গ) অনুমোদনযোগ্য স্বাস্থ্য অভ্যাসের বিকাশ।

৭। ইকোলজিক্যাল ট্রায়াড বলতে কি বুঝ? ২০

ইকোলজিক্যাল ট্রায়াড (Epidemiologicai triad)

এটি রোগ কারণের একটি ধারণা যা এজেন্ট, হোস্ট এবং পরিবেশের মৌলিক কারণগুলিকে সংশ্লেষ করে। এই ধারণাটি বলে যে একটি রোগের প্রক্রিয়া ঘটার জন্য, ঘটনাগুলির G ইউনিক (অনন্য) সমন্বয় থাকতে হবে- অর্থাৎ, একটি ক্ষতিকারক এজেন্ট যা উপযুক্ত পরিবেশে একটি সংবেদনশীল হোস্টের সংস্পর্শে আসে।

৮। প্রসবপূর্ব পরিচর্যা বলতে কি বুঝ? প্রসবপূর্ব পরিচর্যার উদ্দেশ্যসমূহ লিখ।

প্রসবপূর্ব পরিচর্যা/এন্টেনেটাল (প্রিনেটাল) কেয়ার এর সংজ্ঞা ঃ

প্রসবপূর্ব বা প্রসবপূর্ব যত্ন হল গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মহিলার যত্ন নেওয়া, অর্থাৎ যাতে মা এবং ফিটাসকে (শিশু) সর্বোত্তম সম্ভাব্য অবস্থায় প্রসবের সময় নিয়ে আসা হয়।

প্রসবপূর্ব পরিচর্যার উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১। গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মায়ের ‘স্বাস্থ্য’ (শারীরিক, মানসিক এবং মানসিক সুস্থতা) সুরক্ষা এবং সুস্থতা বজায় রাখার উদ্দেশ্য। ২। গর্ভাবস্থায় এর জটিলতাগুলির জন্য উচ্চ ঝুঁকির গ্রুপ সনাক্ত করা এবং তাদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। ৩। কারা সত্যিই উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে তা নির্ধারণ করতে উপযুক্ত ডায়াগনোস্টিক পদ্ধতি। ৪। বিশেষ সহ উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা পরিচালনা করতে মনোযোগ প্রদান করা। ৫। প্রসব এবং স্তন্যপান করানোর জন্য গর্ভবতী মাকে শারীরিক, মানসিক এবং বস্তুগতভাবে প্রস্তুত করা এবং সেসাথে প্রসবের সাথে সম্পর্কিত উদ্বেগ ও ভয় দূর করা। ৬। মাতৃত্বকালীন মৃত্যু এবং অসুস্থতা হ্রাস করা। ৭। পুষ্টি অবস্থা নির্ধারন নিশ্চিত করা। ৮। নবজাতককে প্রথম মাসে যত্ম নেয়ার পদ্ধতি মাকে শেখানোর হয়।

প্রথম অধ্যায়

হাইজিন বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

হাইজিন বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলতে কি বুঝায়? হোমিওপ্যাথিতে ইহার গুরুত্ব আলোচনা কর। ০৯, ১৫, ১৬

হাইজিন বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এর সংজ্ঞা (Definition of hygiene):

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে সর্ব সুস্থ অবস্থায় জীবন-যাপনের জন্য কোন সুষ্ঠু স্বাস্থ্য রক্ষার পরিকল্পনা ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়সমূহ আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে হাইজিন বা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে।

হোমিওপ্যাথিতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা (hygienes importance in Homoeopathy):

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা অর্থাৎ দেহ ও মনের নীরোগ অবস্থাকেই স্বাস্থ্য বলে। আর স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি দেশ ও জাতির সম্পদ। স্বাস্থ্যকে সুন্দর ও রোগ মুক্ত রাখতে হলে স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রাখতে হয়। আর স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এর মাধ্যমে অর্জন করা যায়। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তিগত, সামাজিকভাবে বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। এই সংক্রামক রোগের হাত হতে ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকে বাঁচানোর জন্য এর সংক্রমণ পথ এবং নিবারণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন, গবেষণা প্রভৃতি এই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মাধ্যমে জানা যায়। সংক্রামক রোগ ছাড়াও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাসমূহ, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সমস্যা, রোগের প্রাকৃতিক ইতিহাস, খাদ্য ও পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ, স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে আবর্জনা ও মলমূত্র দূরীকরণ, স্বাস্থ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, পরিবার পরিকল্পনা, প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য

প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা যায় এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সুস্থ থাকা যায়।

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হোমিওপ্যাথিতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম এবং সুদূরপ্রসারী।

২। জনস্বাস্থ্য বলতে কি বুঝ? ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭

জনস্বাস্থ্য এর সংজ্ঞা (Definition of public health) ঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় সমাজের সকলের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় জীবন-যাপনের জন্য বৃহত্তর স্বাস্থ্য রক্ষার পরিকল্পনা ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়সমূহ আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে পাবলিক হেলথ বা জনস্বাস্থ্য বলে।

৩। সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখ। ১৭ (Write in brief the health care delivery system in Bangladesh.)

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা বিতরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা ঃ

বাংলাদেশের জনসাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও দারিদ্রতা প্রভৃতি স্বাস্থ্যনীতি পালনে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সরকারী কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে। যথা-

(i) পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।

(ii) পাবলিক হেলথ সার্ভিসেস।

(iii) পপুলেশন কন্ট্রোল ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং।

৪। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা লিখ। ০৮, ১০, ১৩, ১৪

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা ঃ

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি সমাজ ও দেশের সম্পদ। স্বাস্থ্য বলতে সাধারণতঃ শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাকে বুঝায়। শরীর ও মনের সুস্থ্যতা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলসুর "রোগ আরোগ্যের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা উত্তম"।

(i) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জানা যায়।

(ii) এটি পাঠের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানা যায়।

(iii) এটি পাঠের মাধ্যমে পারিবারিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জিত হয়।

(iv) এটি পাঠের মাধ্যমে সংক্রামক রোগের সংজ্ঞা, কারণ, শ্রেণীবিভাগ, লক্ষণাবলী, ডায়াগনোসিস, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়।

(v) এটি পাঠের মাধ্যমে প্রতিটি কমিউনিটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশনসহ সকল বিষয় সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যায়।

(vi) এটি পাঠের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন এবং রোগ আরোগ্যে ও প্রতিরোধে খাদ্যের ভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জিত হয়।

(vii) এটি পাঠের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিশুর পরিচর্যা ও খাদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা যায়।

(viii) এটি পাঠের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ জীবন-ধারনের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে জানা যায়।

(ix) এটি পাঠের মাধ্যমে বিশ্বসাস্থ্য সংস্থা কি? এর আর্দশ উদ্দেশ্য, বিশ্বের সকল দেশের স্বাস্থ্য ও রোগ আরোগ্য এবং রোগ প্রতিরোধ সম্বন্ধে জানা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৫। হোমিওপ্যাথিতে পাবলিক হাইজিনের গুরুত্ব আলোচনা কর। ১১, ১২, ১৪

হোমিওপ্যাথিতে পাবলিক হাইজিনের গুরুত্ব আলোচনা ঃ

প্রত্যেকটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি "রোগারোগ্যের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করাই সর্বোত্তম"। রোগ প্রতিরোধ করতে হলে হাইজিনের জ্ঞান আবশ্যকীয়। অর্থাৎ

(i) পাবলিক হাইজিনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জানা যায়।

(ii) পাবলিক হাইজিনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানা যায়।

(iii) পাবলিক হাইজিনের মাধ্যমে পারিবারিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জিত হয়।

(iv) পাবলিক হাইজিনের মাধ্যমে সংক্রামক রোগের সংজ্ঞা, কারণ, শ্রেণীবিভাগ, লক্ষণাবলী, ডায়াগনোসিস, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়।

(v) এটির মাধ্যমে প্রতিটি কমিউনিটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশনসহ সকল বিষয় সঠিক জ্ঞান অর্জন করা যায়।

(vi) এটির মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন এবং রোগ আরোগ্যে ও প্রতিরোধে খাদ্যের ভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জিত হয়।

(vii) এটির মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিশুর পরিচর্যা ও খাদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা যায়।

(viii) এটির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ জীবন-ধারনের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে জানা যায়।

(ix) এটির মাধ্যমে বিশ্বসাস্থ্য সংস্থা কি? এটির আর্দশ উদ্দেশ্য, বিশ্বের সকল দেশের স্বাস্থ্য ও রোগ আরোগ্য এবং রোগ প্রতিরোধ সম্বন্ধে জানা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, হোমিওপ্যাথিতে পাবলিক হাইজিনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে পাবলিক হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। ১০, ১২, ১৪

বাংলাদেশে পাবলিক হেল্থ এডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে বর্ণনা ঃ

বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রকল্প পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় রয়েছে। স্বাস্থ্য প্রশাসন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যই এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় স্বাস্থ্য প্রশাসক নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক জেলায় সিভিল সার্জন, ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ সুপারেন্টেড, ফিল্ড সুপারেন্টেড প্রভৃতি স্বাস্থ্য বিষয়ক অফিসার আছেন। জেলা সদরে একজন ডেপুটি সার্জন আছেন। প্রত্যেক উপজেলায় একজন হেল্থ এডমিনিষ্ট্রেটর আছেন এবং তাঁর অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার কাজ করার জন্য অনেক কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন। উপজেলা স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিটি বাড়ী গিয়ে বিভিন্ন ধরনের রোগ ও সংক্রামক রোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগাক্রান্ত লোকদের হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা জনসাধারণকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতি, পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য ও পুষ্টি, মা ও শিশু কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। তারা জন্ম-মৃত্যুসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও সংগ্রহ করেন।

৭। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সমস্যার প্রধান কারণগুলো লিখ। ১৫

(Qus. Write the Main causes of health problem in Bangladesh)

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সমস্যার প্রধান কারণগুলো (Main causes of health problem in Bangladesh) ঃ

(i) কর্ডিন্যাশন ও লিংকেজ এর অভাব।

(ii) সঠিক ডিস্টিবিউশন এবং প্রয়োজন সাদৃশ্যের অভাব।

(iii) অর্থনৈতিক বা আর্থিক অভাব।

(iv) বিদ্যমান সম্পদের সঠিক ব্যবহারের অভাব।

(v) হেল্থ প্ল্যানিং এর পর্যাপ্ত তথ্য বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন এর অভাব।

(vi) উপযুক্ত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রনয়নের অভাব।

(vii) নীরোগ বা. নিরাপদ জনগন বা স্বাস্থ্যবান বা সুস্থ লোকবল প্রস্তুতের অভাব।

(viii) প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা এবং যোগ্যতা অভাব।

(ix) বিকেন্দ্রীকরণের অভাব।

৮। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো বর্ণনা কর। ০৮, ১০

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো বর্ণনা ঃ

(i) পুষ্টিহীনতা।

(ii) কলেরা ও বসন্তের মহামারী প্রকোপ।

(iii) পানিবাহিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রকোপ।

(iv) শহরাঞ্চলে ও পল্লী অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানির সুব্যবস্থা না থাকা।

(v) পল্লী অঞ্চলে সেনিটারী পায়খানা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকা।

(vi) পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য চিকিৎসার অভাব, প্রয়োজনী হাসপাতাল ও চিকিৎসক নাই।

(vii) স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে অসচেতনতা।

(viii) পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহন না করা।

৯। প্রশ্ন ঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কি ? উহার উদ্দেশ্য লিখ। ০৯, ১৪, ১৬
বা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কি ? উহার উদ্দেশ্য কি ? বর্ণনা কর। ১১, ১৫
(Qus. What is World Health Organization? Describe it's object.)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জাতিসংঘের একটি বিশেষ অরাজনৈতিক সংস্থা। (সানফ্রানসিসকোতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সম্মেলনে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে WHO এর জন্ম হয়)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ইংরেজীতে WHO বলা হয়।

WHO means World Health Organization এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৭এপ্রিল ১৯৪৮ সালে। WHO এর সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ডে। WHO এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা দেশ ১৯৪টি। প্রতি বছর ৭ই এপ্রিল "বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস" পালিত হয়।

WHO এর উদ্দেশ্য সমূহ ঃ সকল মানুষের স্বাস্থ্যের উচ্চতর স্তরে অবস্থান নিশ্চিত করাই WHO এর মূল উদ্দেশ্য। WHO এর নিজস্ব গঠনতন্ত্র রয়েছে। এর গঠনতন্ত্রে কতিপয় স্বাস্থ্যনীতি ঘোষিত হয়েছে। যেমন-

(i) বিশেষ বিশেষ রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার।
(ii) পারিবারিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন।
(iii) স্বাস্থ্যপত্র ও তথ্য প্রকাশ।
(iv) স্বাস্থ্য ও পরিসংখ্যান।
(v) অন্যান্য স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সহযোগীতা করা ইত্যাদি।

মূলতঃ WHO এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

১০। প্রশ্ন ঃ WHO এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশসমূহের নাম এবং সদস্যপদ লাভের বৎসর উল্লেখ কর। ০৮, ১০

WHO এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশসমূহের নাম এবং সদস্যপদ লাভের বৎসর ঃ

ক্রঃ নং	WHO এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশসমূহের নাম	সদস্যপদ লাভের বৎসর
১.	ভারত	১৯৪৮ সাল
২.	বার্মা	১৯৪৮ সাল
৩.	শ্রীলঙ্কা	১৯৪৮ সাল
৪.	থাইল্যান্ড	১৯৪৭ সাল
৫.	ইন্দোনেশিয়া	১৯৫০ সাল
৬.	নেপাল	১৯৫৩ সাল
৭.	মঙ্গোলিয়া	১৯৬২ সাল
৮.	মালদ্বীপ	১৯৬৫ সাল
৯.	বাংলাদেশ	১৯৭২ সাল
১০.	কোরিয়া (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)	১৯৭৩ সাল
১১.	ভুটান	১৯৮২ সাল

১১। প্রশ্ন ঃ কম্যুনিটি মেডিসিন কাকে বলে ?

কম্যুনিটি মেডিসিন এর সংজ্ঞা ঃ

সমষ্টিগতভাবে সমাজের সকল মানুষের দৈহিক ও মানসিক সুস্থ্যতা রক্ষার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল দ্বারা সমাজের মানুষের নিকট স্বাস্থ্য সেবা পৌছিয়ে দেয়ার পদ্ধতিকে কম্যুনিটি মেডিসিন বলে।

১২। প্রশ্ন : জেনেভা ঘোষণাটি সংক্ষেপে লিখ। ০৮

জেনেভা ঘোষণা :

লন্ডন বিশ্ব মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় ১৯৪৮ সালের ১২ই অক্টোবর যে ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়, তাকে জেনেভা ঘোষণা বলা হয়।

জেনেভা ঘোষণাটি নিম্নরূপ :

(i) আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ঘোষণা করছি যে, মানবতার সেবায় আমার জীবন উৎসর্গ করলাম।

(ii) বিশ্বস্ততা ও মর্যাদার সাথে আমি আমার পেশায় নিয়োজিত থাকব।

(iii) রোগীর স্বাস্থ্যই আমার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হবে।

(iv) আমি আমার শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করব।

(v) আমি আমার সর্বস্ব ক্ষমতা দিয়ে চিকিৎসা পেশার সম্মান ও মহৎ ঐতিহ্য বজায় রাখব।

(vi) আমার সহকর্মীদের আমি আমার সহোদরের মত মনে করব।

(vii) আমার রোগী ও কর্তব্য এর মাঝে কোন জাতি, ধর্ম, গোত্র, দলীয় রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়কে প্রশ্রয় দিব না।

(viii) আমার নিকট রোগীর বর্ণিত গোপনীয়তার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল ও বিশ্বস্ত থাকব।

(ix) ভ্রূণ জন্ম নেয়ার পর হতে জীবনের মূল্য সম্পর্কে আমি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করব।

(x) কোনরূপ হুমকি বা ভীতির মুখেও আমি আমার চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে মানবতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করব না।

১৩। প্রশ্ন : প্রিভেনটিভ মেডিসিন ও সোসিয়াল মেডিসিন কাকে বলে ?

প্রিভেনটিভ মেডিসিন (Preventive medicine) ঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায়, রোগ প্রতিরোধ করে জীবনকে দীর্ঘায়িত, শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা ও উদ্যমকে বৃদ্ধি করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা, তাকে প্রিভেনটিভ মেডিসিন বলে।

সোসিয়াল মেডিসিন (Social medicine) ঃ

গোটা সমাজ হতে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য এবং গোটা সমাজের স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য সামাজিক ও মেডিকেল উভয় ব্যবস্থার মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রক্রিয়াকে সোসিয়াল মেডিসিন বা সামাজিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে।

১৪। প্রশ্ন ঃ লীগ অব নেশনস এর স্বাস্থ্য সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

লীগ অব নেশনস এর স্বাস্থ্য সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ঃ

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপি রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে লীগ অব নেশনস এর অধীনে এক স্বাস্থ্য সংস্থা গঠন করা হয়। এ স্বাস্থ্য সংস্থা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি, গৃহ, পল্লী স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ছিল ইহা সিঙ্গাপুরে ফার ইষ্টার্ন ব্যুরো নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক কারণে ইহা ভেঙ্গে গেলেও বর্তমানে ইহার স্বাস্থ্য সংস্থার কাজ জেনভায় চলছে।

১৫। প্রথম আন্তর্জাতিক সেনিটারী কনফারেন্স সম্বন্ধে আলোচনা কর।

প্রথম আন্তর্জাতিক সেনিটারী কনফারেন্স সম্বন্ধে আলোচনা ঃ

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে প্রথম আন্তর্জাতিক সেনিটারী কনফারেন্স আহবান করা হয়, রোগ সংক্রমণের ব্যাপকতা প্রতিরোধের করার জন্য। এতে গ্রেট ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, পর্তুগাল, স্পেন, রাশিয়া, তুরস্ক, ইতালি প্রভৃতি দেশসমূহ অংশ গ্রহন করে। উক্ত সম্মেলনে ছয় মাস যাবৎ সংক্রমণ নিবারনের জন্য নানা বিধি বিধান প্রণয়ন ও বিভিন্ন দেশে সঙ্গরোধ আইনের সমতা বিধানের এক প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া কয়েকটি দেশ সঙ্গরোধ প্রথার বিরোধিতা করায় প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও সম্মেলনের একটি আন্তর্জাতিক সেনিটারী আইন প্রস্তুত করা হয়। এতে কলেরা, প্লেগ, ইয়োলো ফিভার সম্পর্কে ১৩৭টি ধারা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু এ আইন কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই, কারণ প্রথমে ফ্রান্স, পর্তুগাল ও সারাদিনা এতে সমর্থন করলেও পরবর্তীতে তাদের মধ্যে মতান্তর ঘটে এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাল ও সারাদিনা তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে। শেষ পর্যন্ত উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৫১ হতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দশটি সম্মেলন হলেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে মত বিরোধ থাকায় সঙ্গরোধ সম্পর্কে কোন চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয় নাই।

১৬। প্রশ্ন ঃ প্যান আমেরিকান সেনিটারী ব্যুরো সম্বন্ধে যা জান লিখ।

প্যান আমেরিকান সেনিটারী ব্যুরো সম্বন্ধে বর্ণনা (PASB) ঃ

আন্তর্জাতিক সেনিটারী কনফারেন্সের পর আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে প্যান আমেরিকান সেনিটারী ব্যুরো। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয় এবং প্যান আমেরিকা সেনিটারী ব্যুরো নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়। ইহা যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গরোধ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। আমেরিকান সরকার প্যান আমেরিক

সেনিটারী কোড নামক একটি দলিল প্রস্তুত করে এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সরকার ইহা অনুমোদন করে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত ব্যুরোর "প্যান আমেরিকান সেনিটারী অর্গ্যানাইজেশন" (PASO) নামকরণ করা হয়। এ সংস্থা একটি চুক্তির অধীনে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ হতে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) আঞ্চলিক অফিস হিসাবে কাজ করছে। ইহা ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে "প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গ্যানাইজেশন" নামধারণ করে। বর্তমানে ইহার প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত।

১৭। প্রশ্ন ঃ আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির বর্ণনা দাও।

আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির বর্ণনা ঃ হেনরি ডুনান্ট নামের একজন সুইস ব্যবসায়ী কোন এক যুদ্ধের দৃশ্যে আহত ও দুর্দশাগ্রস্থ সৈন্যদেরকে দেখে মর্মাহত হন এবং তাদের সাহায্যার্থে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। তিনিই এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি একটি বেসরকারী অরাজনৈতিক সংস্থা। যুদ্ধাহত এবং আর্ত-মানবতার সেবায় এ সংস্থা নিয়োজিত। ১৯৬৪ সালে প্রথম জেনেভা কনভেনশনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধাহত সৈন্যদের সাহায্য ও চিকিৎসা করা এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। ১৯১৯ সালে লীগ অব দি রেডক্রস সোসাইটি সৃষ্টি করে এর কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়। এর প্রধান কার্যালয় জেনেভাতে। জন্মের পর হতেই বিশ্বের একটি শক্তিশালী মিশন হিসাবে ইহা কাজ করে আসছে। বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র এই সংস্থার শাখা বিদ্যমান। যুদ্ধাহত সৈনিকদের সেবা ছাড়াও এ সংস্থা এখন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করে আর্তমানবতার সেবা করে আসছে। যেমন- এর কয়েকটি কার্যক্রম রক্তদান, নার্সিং, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, প্রসূতি ও শিশুদের চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহন, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশু মঙ্গল প্রভৃতি চালু আছে।

১৮। প্রশ্ন ঃ রেডক্রসের মূলনীতি সমূহ লিখ।

রেডক্রসের মূলনীতিসমূহ ঃ

১৯৪৯ সালে প্রণীত রেডক্রসের মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i) মানবতা – রেডক্রসের লক্ষ্য মানুষের জীবন বাঁচানো, স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং পরস্পরের প্রতি সমঝোতা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করা।

(ii) পক্ষপাতহীন ঃ দেশ, জাতি, বর্ণ, রাজনৈতিক মত পার্থক্য নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানভাবে কাজ করা এবং সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থকে আগে সাহায্য করা।

(iii) নিরপেক্ষতা ঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ভৌগলিক কারণে বিবাদ মান দুই শিবিরের মাঝে কাজ করতে গেলে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা।

(iv) স্বাধীনতা ঃ যদিও কোন দেশের রেডক্রস সে দেশের আইন দ্বারা প্রভাবিত হয় তবুও একে তার মৌলিকতা বা স্বাতন্ত্র বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে, যাতে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

(v) ভলন্টারী সেবামূলক কাজ ঃ ইহা একটি সেচ্ছায় শ্রমের ভিত্তিতে গঠিত সাহায্য সংস্থা, যা কোনরূপ লাভ আদায়ের জন্য করে না।

(vi) একতা ঃ যে কোন দেশে মাত্র একটি রেডক্রস সংস্থা থাকবে এব ইহা শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সাথে সমন্বয় সাধন করে নি দেশে কাজ করবে।

(vii) সার্বজনীনতা ঃ ইহা একটি বিশ্বব্যাপি বিস্তৃত সংস্থা, যাতে পৃথিবী সকল মানুষের এক সমান অধিকার ও মর্যাদা।

১৯। প্রশ্ন ঃ জাতিসংঘের ত্রাণ ও পূনর্বাসনের বর্ণনা দাও।

জাতিসংঘের ত্রাণ ও পূনর্বাসনের বর্ণনা ঃ ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য "ত্রাণ ও পুনর্বাসন" নামক একটি সংস্থা গঠিত হয়। ইহার নাম জাতিসংঘ ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রশাসন। ইহার অধীনে একটি স্বাস্থ্য বিভাগ ছিল। এ স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্দেশ্য মহামারী রোগ প্রতিরোধ এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা। এ সংস্থা গ্রীস, ইটালী ও সারাদিনা হতে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের ভূমিকা গ্রহণ করে কৃতকার্য হয়। ১৯৪৬ সালের পরে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু ইহার স্বাস্থ্য বিভাগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে চলে যায়।

২০। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাসমূহের নাম লিখ।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাসমূহের নাম ঃ

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাসমূহের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

(i) আন্তর্জাতিক সেনিটারী কনফারেন্স।

(ii) প্যান আমেরিকান সেনিটারী ব্যুরো।

(iii) লীগ অব নেশনস এর স্বাস্থ্য সংস্থা।

(iv) ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।

(v) ওয়াল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন।

(vi) ইউনাইটেড নেশনস সিলড্রেন ইমার্জেন্সী ফান্ড।

(vii) ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেল অব রেড ক্রস সোসাইটি।
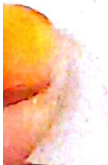
দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্য শিক্ষা

১। প্রশ্ন ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা বলতে কি বুঝ ?

(Qus. What is health education?)

স্বাস্থ্য শিক্ষার সংজ্ঞা ঃ

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম-কানুন এবং বিধি-বিধান সম্বন্ধে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে স্বাস্থ্য শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য মানুষের অত্যাবশকীয় দুইটি মৌলিক অধিকার যার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার সাথে সাথে জনগণের সুস্বাস্থ্যেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উভয়ের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের মানুষের উন্নতি সাধন সম্ভব।

২। প্রশ্ন ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যম ও পদ্ধতিগুলি লিখ। ১৩, ১৫, ১৭

(Qus. Write the methods and media of health education.)

বা, স্বাস্থ্য শিক্ষার নীতিসমূহ কি কি ?

স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যম ও পদ্ধতিগুলি ঃ

(i) উদ্বকরণ ঃ জনগনকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

(ii) আক্ষরিক জ্ঞান ঃ জনগণের আক্ষরিক জ্ঞান এবং বোধগম্যের মান বিচার করে স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষায় যাতে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে সেভাবে শিক্ষাদান করতে হবে।

(iii) আগ্রহ ও স্বার্থ ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে।

(iv) অংশ গ্রহন ঃ দলগত আলোচনা, কার্যশাখা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহন থাকতে হবে।

(v) পুনঃউপস্থাপন ঃ কোন একটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন সকলের পক্ষে একই সময়ে সম্ভবপর নাও হতে পারে। পরবর্তীতে ঐ বিষয় বার বার উপস্থাপনা করে সকলের বোধগম্য করতে হবে।

(vi) হাতে কলমে শিক্ষাদান ঃ কোন একটি বিষয় বা কার্যক্রম দেখে বা নিজে করে হাতে কলমে শিক্ষাদান করতে হবে।

(vii) নেতৃত্ব ঃ গ্রামের নেতৃবৃন্দকে জনগণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। তাই তাঁদেরকে স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে তাঁদের বিশ্বাস ও সমর্থন আদায় করতে পারলে কর্মসূচী বাস্তবায়ন সহজতর হয়।

৩। প্রশ্ন ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলতে কি বুঝ ?

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি সমাজ ও জাতির অমূল্য সম্পদ। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলতে সম্পূর্ণরূপে রোগ প্রতিরোধ বা প্রতিষেধক বুঝায়। জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ রোগ থেকে মুক্ত থাকার পদ্ধতি, রোগের সংক্রমণ ও রোগ বিস্তার রোধে বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা করাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বলে। যেমন - শিশুদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, বৃদ্ধদের বিভিন্ন রোগ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের বিভিন্ন রোগের বিস্তার ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

৪। প্রশ্ন ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে? অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক চিকিৎসা বর্ণনা কর।

প্রাথমিক চিকিৎসার সংজ্ঞা ঃ

হঠাৎ কোন ব্যক্তি সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা দুর্ঘটনায় পতিত হলে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার পূর্বে রোগীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য তাৎক্ষনিকভাবে যে সব ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

অস্থি ভাঙ্গলে রোগীকে প্রথমে স্থিরভাবে শোয়াতে হবে। স্প্রিন্টার ব্যবহার না করে রোগীকে স্থানান্তরিত করা যাবে না। পায়ের অস্থি ভাঙ্গলে দুই ইঞ্চি চওড়া ও বেশ লম্বা বাঁশের কিংবা কাঠের টুকরা অথবা পীচ বোর্ড কেটে স্প্লিন্ট তৈরী করতে হয়। হাতের স্প্লিন্টগুলো প্রায় ১ফুট দীর্ঘ এবং পায়ের স্প্লিন্টগুলো পায়ের পাতা হতে প্রায় পেলভিস পর্যন্ত লম্বা করতে হবে। স্প্লিন্ট লাগাবার পূর্বে ভাঙ্গা হাত কিংবা পা খুব সাবধানে টেনে একটু সোজা করে হাড়ের খন্ডদ্বয় করতে হবে। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে হাত রেখে ভংগ অস্থির প্রান্তদ্বয় মিশিয়ে দিতে হবে যাতে সমস্ত. হাড়টি সোজা থাকে। তারপর আহত স্থানে নরম কাপড় বা প্যাড দিয়ে আবৃত করে স্প্রিন্টগুলো উহার উপর ও নীচে সাজিয়ে শক্তভাবে বেঁধে দিতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীকে প্রয়োজন মত হাসপাতাল কিংবা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে।

৫। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝ ?

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ঃ

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলতে কোন বিশেষ ব্যক্তির বা নিজের খাদ্য-পানীয়, ঘুম, বিশ্রাম, পোষাক-পরিচ্ছেদ, বাসস্থান প্রভৃতি দ্বারা নিয়মিত অভ্যাস করে সুস্থ ও কর্মক্ষম থেকে দীর্ঘজীবন লাভ করা বুঝায়।

৬। প্রশ্ন ঃ জনস্বাস্থ্য বলতে কি বুঝ? প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার নীতিসমূহ আলোচনা কর। ১৭

Principles of Primary Health Care (PHC)

1. সমানভাবে স্বাস্থ্য সেবা ডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে। অর্থাৎ ধনী-গরীব এবং শহর-গ্রাম এর জনগন সমানভাবে স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা। (Equitable distribution of health services. This means that health services must be shared by all people irrespective of their ability to pay, and all (rich or poor, urban or rural) must have access to health services.)
2. Community participation (Active involvement of individuals, families, and communities in promotion of their own health).
3. Multisectorial approach (Coordinated action between health sector and other related sectors).
4. Appropriate technology should be used.

৭। প্রশ্ন ঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপাদানসমূহ কি কি ?

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপাদানসমূহ ঃ

(i) প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা।

(ii) পুষ্টিকর খাদ্য অর্থাৎ সুষম খাদ্য সম্পর্কে সকলকে শিক্ষা দেয়া।

(iii) সকল শিশুকে রোগ প্রতিষেক টিকা দেয়া ও ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো ব্যবস্থা করা।

(iv) বিশুদ্ধ খাবার পানি পান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

(v) মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা।

(vi) পরিবার পরিকল্পনা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জনসংখ্যার হার নিয়ন্ত্রণ করা।

৮। প্রশ্ন ঃ মেন্টাল হাইজিন কি ?

মেন্টাল হাইজিন ঃ

যে সকল কলাকৌশল দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও তার উন্নতি সাধিত হয়, তাকে মেন্টাল হাইজিন বলে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে শাখায় মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের কলা কৌশল সম্পর্কে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে মেন্টাল হাইজিন বলে।

৯। প্রশ্ন ঃ মনোবিকারের কারণগুলো লিখ। ১৬

মনোবিকারের কারণসমূহ ঃ

মনোবিকার বা মানসিক রোগের জন্য কোন একটা বিশেষ কারণকে দায়ী করা যায় না। শারীরিক রোগের মত ইহারও একাধিক কারণ রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণিত হল।

(i) বংশগত কারণ ঃ মানসিক রোগ সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হল বংশগত। বংশগত মানসিক রোগ উপযুক্ত পরিবেশ পেলে রোগটি আত্মপ্রকাশ করে। যেমন- হিষ্টেরিয়া দুশ্চিন্তা গ্রস্থতা প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে বংশগত প্রভাব শুধুমাত্র প্রবণতা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু অনুকূল পরিবেশ না পেলে মনোবিকার ঘটে না।

(ii) **দৈহিক কারণ** ঃ মস্তিষ্কে আঘাত বা রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য মনোবিকার ঘটতে পারে।

তাছাড়া দীর্ঘদিন শারীরিক রোগের ফলেও মনোবিকার ঘটে থাকে। যেমন - মস্তিষ্কের আঘাতের ফলে উন্মাদ রোগ।

(iii) **সামাজিক ও পরিবেশগত কারণ** ঃ মানসিক রোগ সৃষ্টিতে যে সকল সামাজিক ও পরিবেশগত কারণগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে দূশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, ব্যর্থ প্রেম, হতাশা, অসুখী, বিবাহবিচ্ছেদ, দারিদ্রতা, অবহেলা, নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি। মূলত সামাজিক পরিবেশই ব্যক্তির মনোভাব

নির্ধারণ করে। তাছাড়া পরিবেশগত অনেক কারণ রয়েছে যা মানুষের আচরণকে অস্বাভাবিক করতে পারে।

ক) বিষাক্ত পদার্থ ঃ CO_2, পারদ, টিন, সীসা, এলকোহল ইত্যাদি।

খ) পুষ্টি সম্পর্কিত খাদ্য।

গ) খনিজ আয়োডিন।

ঘ) আঘাতজনিত কারণ। পেশী সম্পর্কিত, এক্সিডেন্ট, সড়ক দূর্ঘটনা।

ঙ) সংক্রমনশীল কারণ- জন্মের পূর্বে বা সময়ে বা পরে হাম (রুবেলা) ইত্যাদি।

চ) বিকিরণ- তেজস্ক্রিয় বিকিরনে মস্তিষ্কের বিকার ঘটে।

(iv) **মনস্তাত্বিক কারণ** ঃ মনোসমীক্ষার মাধ্যমে মনের ৩টি স্তরের সন্ধান মিলে।

ক) কেন্দ্রিয় অন্তঃস্থল ঃ একে জৈবিক মন বলে। যা প্রতিটি জীবন্ত দেহে বিদ্যমান।

খ) অহং ঃ নিজ ও পরিবেশ সম্বন্ধে চেতনা বোধই হল অহং। ইহাকে বিবেক বলে। এদ্বারা মানুষ ভাল মন্দ নির্ণয় করে চলতে পারে সমাজে।

গ) অতি অহং ঃ ইহাকে বিবেক বলে। এর দ্বারা মানুষ ভাল মন্দ নির্ণয় করে চলতে পারে সমাজে।

মনের এই ৩টি স্তরের মধ্যে পরস্পর অহরহ দ্বন্দ চলেছে জীবন পথে প্রতিটি পদক্ষেপ এই দ্বন্দ থেকে মানসিক রোগের উৎপত্তি হয়।

১০। প্রশ্ন ঃ মানসিক বিকৃতি প্রতিরোধের উপায় আলোচনা কর। ১২,
বা, মেন্টাল হাইজিন কি? মানসিক বিকৃতি/রোগের প্রতিরোধের উপায় আলোচনা কর। ১৪, ১৭

মেন্টাল হাইজিন ঃ

যে সকল কলাকৌশল দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও তার উন্নতি সাধিত হয়, তাকে মেন্টাল হাইজিন বলে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে শাখায় মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনের কলা কৌশল সম্পর্কে আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে মেন্টাল হাইজিন বলে।

মানসিক বিকৃতি প্রতিরোধের উপায় ঃ

যে কোন রোগের সমাধানের সর্বোত্তম ব্যবস্থা হল প্রতিরোধক ব্যবস্থা। মানসিক সমস্যার ও তেমনি সমাধান হয় প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহন করলে। সেজন্য সুশিক্ষা, ভালভাবে শিশুর প্রতিপালন, গৃহের উন্নত পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও দৃষ্টি ভঙ্গির প্রয়োজন। আর সেজন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে নিম্নবর্ণিত উপায়গুলো মেনে চলতে হবে।

(i) শিশুর মনের উপর বংশগত প্রভাব থাকে বলে জন্মের পূর্ব হতেই মাতা পিতার শরীর ও মনের সুস্থ্যতা বজায় রাখতে হবে।

(ii) শিশুর প্রাকৃতিকভাবে অবাঞ্ছিত কোন বৈশিষ্ট্য দেখা দিলে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য শারীরিক সুস্থ্যতার প্রয়োজন সুতরাং প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

(iv) মনে অন্তঃদ্বন্দ্বই প্রায় সকল প্রকার মানসিক রোগের কারণ। তাই শৈশব কাল হতে শিশুর মনে কোন প্রকার দ্বন্দ যাতে সৃষ্টি না হয় তার জন্য পিতা মাতার সতর্ক থাকতে হবে।

(v) শিশুদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চিন্তা ধারার প্রতি সহনশীল হতে হবে।
(vi) পূর্ণ বয়স্ক কোন মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পূর্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করলে তার শিশুকালের কোন স্নায়ুবিক গোলযোগের সন্ধান পাওয়া যাবে। তাই শৈশবকালে মাতা-পিতা, শিক্ষক, চিকিৎসক শিশুর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন ভবিষ্যতে অনেক দূর্ভোগ হতে অব্যহতি পাওয়া যায়।

১১। প্রশ্ন ঃ মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।

মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব ঃ

মনই মানবদেহকে পরিচালনা করে। মনের বল দ্বারা মানুষ সর্বপ্রকার কার্য সম্পাদন করে। মন দুর্বল হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই কোন সুফল পাওয়া যায় না। মানুষের শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক নিবিড়। মন সুস্থ না থাকলে দেহও সুস্থ থাকে না। কাজেই মানুষের দেহ ও মনকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না। দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। দেহ সুস্থ না থাকলে মন যেমন- সাচ্ছন্দ্য হারায়, তেমনি অসুস্থ মনের অধিকারী তার দৈহিক স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। আত্ম সন্তুষ্টি মানসিক স্বাস্থ্যের বড় নিদর্শন। মানসিক সুস্থতা মানুষ নিজের অধিকার ও অন্যের হক আদায়ে যথেষ্ট সহায়তা দেয়। সে সমস্যার সামনে বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান দিতে চেষ্টা করে। সুতরাং সুখী জীবন ও সুখী সমাজ গড়ে তোলার জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

১২। প্রশ্ন ঃ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে তুলনা কর। ০৯, ১৬

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে তুলনা ঃ

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য		মানসিক স্বাস্থ্য
কোন বিশেষ ব্যক্তির আহার-বিহার, কর্ম-বিশ্রাম, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি দ্বারা নিয়মিত অভ্যাস করে সুস্থ ও কর্মক্ষম থেকে দীর্ঘ জীবন লাভ করাকে, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বলে।	১	মানসিক স্বাস্থ্য হল মন প্রফুল্ল ও সর্ববিষয়ে মনের শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব বোধ সম্পন্ন তাকে বোঝায়।
স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের কলা কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে।	২	স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে শাখায় মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ মানসিক উন্নতি সাধনের কলা কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাকে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে।
মনের পরিচ্ছন্নতা, বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতা, সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, পান, পরিশ্রম, ব্যায়াম ইত্যাদি।	৩	প্রফুল্লতা আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলাবোধ, অল্পে তুষ্ট, ধৈর্য, দায়িত্ববোধ, দৈহিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি।
সকল প্রকার মায়াজম দ্বারা সংগঠিত হতে পারে।	৪	সাধারণত সোরা দোষ মনকে কলুষিত করে। মানসিক বিকৃতি সৃষ্টি করে।
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের অবহেলার কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে।	৫	মানসিক স্বাস্থ্যের বিশৃঙ্খলার কারণে মানুষের মনের বিকৃতি ঘটিয়ে অনেক সময় মানুষ উন্মাদনা বা পাগল হয়ে যেতে পারে।

১৩। প্রশ্ন ঃ শ্রমস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য যে সকল বিধি-বিধান পালন করা উচিত তা লিখ। ১৪

শ্রমস্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য যে সকল বিধি-বিধান পালন করা উচিত তা নিম্নরূপ ঃ

(i) কর্ম সময় নির্ধারণ ঃ শ্রমিকদের কর্মস্থলে সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে। ১৮ বছরের নিচে শ্রমিকদের উত্তেজক, বিষাক্ত কষ্টকর পরিবেশের মধ্যে কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়। মহিলা শ্রমিকদের কর্ম সময় কমিয়ে দিতে হবে।

(ii) কর্মস্থলে আলো বাতাসের ব্যবস্থা ঃ শ্রমিকদের কর্মস্থলে পর্যাপ্ত আলো ও মুক্ত বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে। কম আলোতে কাজ করলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হবে।

(iii) স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিদর্শন ঃ প্রত্যেক সপ্তাহে বা মাসে একবার করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ শিল্প- কারখানার আঙ্গিনা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

(v) বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানদান ঃ শিল্প-কারখানায় কোথায় কি ধরনের বিপদের সম্ভবনা আছে তা শ্রমিকদের অবগত করাতে হবে।

(vi) কর্মস্থলে দূর্ঘটনার সময় বিকল্প পথের ব্যবস্থা ঃ দূর্ঘটনার সময় শিল্প-কারখানা হতে বিকল্প পথে বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪। প্রশ্ন ঃ মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখ। ০৮, ১১

নিম্নে দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে তুলনা করা হল ঃ

দৈহিক স্বাস্থ্য		মানসিক স্বাস্থ্য
কোন ব্যক্তি নিজের শরীরকে ঠিকভাবে সকল জৈবিক ক্রিয়া পরিচালনে সক্ষম হলে, তাকে দৈহিক স্বাস্থ্য বলে।	১	মানসিক স্বাস্থ্য হল মন প্রফুল্ল ও সর্ববিষয়ে মনের শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব বোধ সম্পন্নতাকে বোঝায়।
যে বিদ্যা দ্বারা শরীর রক্ষার নিয়ম পালন সম্বন্ধে জানা যায়, তাকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে।	২	স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের যে শাখায় মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণ মানসিক উন্নতি সাধনের কলা কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, তাকে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলে।
মনের পরিচ্ছন্নতা, বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতা, সুষম খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, পান, পরিশ্রম, ব্যায়াম ইত্যাদি।	৩	প্রফুল্লতা আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খরাবোধ, অল্পে তুষ্ট, ধৈর্য, দায়িত্ববোধ, দৈহিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি।
সকল প্রকার মায়াজম দ্বারা সংগঠিত হতে পারে।	৪	সাধারণত সোরা দোষ মনকে কলুষিত করে। মানসিক বিকৃতি সৃষ্টি করে।
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের অবহেলার কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হতে পারে।	৫	মানসিক স্বাস্থ্যের ত্রুটিতে মানব মনের বিকৃতি ঘটিয়ে অনেক সময় মানুষ উন্মাদনা বা পাগল হয়ে যেতে পারে।

১৫। প্রশ্ন ঃ মানসিক রোগের/ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা কর।

মানসিক রোগের/ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি বর্ণনা ঃ

মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাঃ হ্যানিম্যান অর্গানন অব মেডিসিন ২২৮-২৩০ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

(i) মানসিক রোগগ্রস্থ রোগীর আচার-আচরণ যদি অশোভন হয় এবং অশ্লীল কথা বার্তা বলে তবে তার প্রতি অমনোযাগ ও অবহেলা প্রদর্শন করা যাবে না।

(ii) সকল প্রকার উত্তেজনার প্রভাব হতে রোগীকে দূরে রাখে হবে।

(iii) রোগীর প্রচন্ড উন্মত্ততায় রোগীর সম্মুখে শান্তভাব, ভয়শূণ্যতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হবে।

(iv) অত্যন্ত সহজ সরল ও অভয়ের সাথে কথা বলে তাঁর কষ্টকর লক্ষণসমূহ জেনে রোগীলিপি তৈরী করে সদৃশ একটি ঔষধ নির্বাচন করতে হবে।

(v) জোরপূর্বক কোন ঔষধ সেবন করানো যাবে না, রোগী যখন শান্ত থাকবে তখন ঔষধ সেবন করাতে হবে।

(vii) চিকিৎসক ও পরিচর্যাকারী উভয় রোগীর সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে।

(vii) রোগীর রোগ লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে, একটির পর একটি সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

(viii) রোগ আরোগ্য হলে পরবর্তীতে একটি এন্টিসোরিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়
রোগ ও রোগের প্রাকৃতিক ইতিহাস

6. Natural- history of disease, Iceberge phenomana, level of prevention of diseases.

১। রোগ কি? রোগচক্রের বিভিন্ন স্তরগুলোর নাম লিখ। ১৩, ১৫

(Qus. What is disease ? Write the name of different system of disease cycle.)

রোগের সংজ্ঞা ঃ

জীবন বিরোধী কোন শক্তি বা প্রভাবের দ্বারা মানুষের জীবনীশক্তির বিশৃংখলা হেতু দেহ ও মনে প্রকাশিত অস্বাভাবিক চিহ্ন ও লক্ষণাবলীকে রোগ বলা হয়। রোগ হলো অজড়, অশুভ, প্রাকৃতিক শক্তি যা জীবনীশক্তির উপরে প্রভাব বিস্তার করলে দেহ ও মনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জীবনীশক্তির বিশৃংখলার ফলে শারীরিক ও মানসিক অস্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়াকেই রোগ বলে।

রোগচক্রের বিভিন্ন স্তরগুলোর নাম ঃ রোগচক্রের ৬টি স্তর নিম্নরূপ-

(i) স্টেজ-১ বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড় (Stage -1 or Incubation period)।

(ii) স্টেজ-২ বা প্রোডোমাল পিরিয়ড় (Stage -2 or Prodromal period)।

(iii) স্টেজ-৩ বা ট্রপিক্যাল ক্লিনিক্যাল পিরিয়ড় (Stage-3 or Fastigium or Typical clinical period)।

(iv) স্টেজ-৪ বা ডেফারভিসেন্স (Stage -4 or Defervescence)।

(v) স্টেজ-৫ বা কনভালসেন্স (Stage -5 or Convalescence)।

(vi) স্টেজ -৬ বা ডিফেকশন (Stage - 6 or Defection)।

২। প্রশ্ন ঃ রোগ কি? ইহার শ্রেণীবিভাগ কর।

রোগের সংজ্ঞা ঃ

জীবন বিরোধী কোন শক্তি বা প্রভাবের দ্বারা মানুষের জীবনীশক্তির বিশৃংখলা হেতু দেহে ও মনে প্রকাশিত অস্বাভাবিক চিহ্ন ও লক্ষণাবলীকে রোগ বলা হয়। রোগ হলো অজড়, অশুভ, প্রাকৃতিক শক্তি যা জীবনীশক্তির উপরে প্রভাব বিস্তার করলে দেহ ও মনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জীবনীশক্তির বিশৃংখলার ফলে শারীরিক ও মানসিক অস্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়াকেই রোগ বলে।

রোগের শ্রেণীবিভাগ ঃ

হোমিওপ্যাথির নিয়মনীতি অনুসারে রোগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ-

(i) তরুণ রোগ বা অচির রোগ (Acute Diseases)।

(ii) পুরাতন রোগ (Chronic Diseases) বা চিররোগ।

(i) তরুণ রোগ আবার তিন প্রকার যথা ঃ

(ক) ব্যক্তিগত তরুণ রোগ, (খ) বিক্ষিপ্ত তরুণ রোগ ও

(গ) মহামারী তরুণ রোগ।

(ii) পুরাতন রোগ আবার তিন প্রকার। যথা ঃ

(ক) মিথ্যা চিররোগ, (খ) প্রকৃত চিররোগ ও

(গ) ঔষধজনিত চিররোগ।

৩। প্রশ্ন ঃ রোগের উত্তেজক কারণগুলি কি কি ?

রোগের উত্তেজক/পরিপোষক কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i) বংশগত কারণে, (ii) বয়স, (iii) লিঙ্গ (পুরুষ/মহিলা), (iv) ঋতু, (v) আবহাওয়া, (vi) পেশা, (vii) পারিবারিক অবস্থা, (viii) সামাজিক অবস্থা, (ix) ব্যক্তিগত অভ্যাস, (x) শারিরীক গঠন (xi) পুষ্টির অবস্থা (xii) বাসস্থান (xiii) বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।

৪। প্রশ্ন ঃ আইসবার্গ ফেনোমেনা অব ডিজিজ বলতে কি বুঝ? ১৩

আইসবার্গ ফেনোমেনা অব ডিজিজ এর বর্ণনা ঃ

Iceberge শব্দটির অর্থ হল তুষার পর্বত আর Phenomena of Disease পানিতে ভাসমান একটি তুষার পর্বত যে সামান্য অংশ পানির উপর ভেসে থাকে এবং মানুষের নজরে পড়ে, তাকে বুঝানো হয়েছে। তুষার পর্বতের বাকী বৃহৎ অংশটি মানুষের নজরে পড়ে না। মানুষের রোগকে পানিতে ভাসমান বরফের স্তুপ দৃশ্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষের বহু রকম রোগের মধ্যে সকল রোগের সঙ্গে চিকিৎসকের পরিচয় ঘটে না। সীমিত সংখ্যক রোগ নিয়ে চিকিৎসা করে থাকেন। রোগের বৃহৎ অংশের সাথে পরিচয় না ঘটার কারণে উহার চিকিৎসা পদ্ধতি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। মূলত আইসবার্গ ফেনোমেনা বলতে তাই বুঝানো হয়েছে।

৫। প্রশ্ন ঃ স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ রচনায় প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলি কি কি ?

স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ রচনায় প্রজয়োনীয় মৌলিক বিষয়সমূহ ঃ

স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ রচনায় প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলি নিম্নরূপ। যথা - (i) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ।

(ii) স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে মল মূত্র অপসারণ।

(iii) স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে শুষ্ক আবর্জনা অপসারণ।

(iv) রোগ বাহক জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ।

(v) খাদ্য সংরক্ষণ, রন্ধন ও পরিবেশনে বিজ্ঞান সম্মত উপায় অবলম্বন।

(vi) বসত বাড়ী নির্মানে স্বাস্থ্যের পরিবেশ রক্ষা করা।

(vii) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা।

(viii) পেশা সম্পর্কিত বিপত্তি নিয়ন্ত্রণ ও কল কারখানার বিপদমুক্ত।

(ix) মৃত্তিকা দূষণ নিয়ন্ত্রণ।

৬। প্রশ্ন ঃ এনডেমিক ও প্যানডেমিক রোগের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ১৩

এনডেমিক ও প্যানডেমিক রোগের মধ্যে পার্থক্য ঃ

এনডেমিক		প্যানডেমিক
কোন সংক্রামক রোগ কোন স্থানে সারা বৎসর লেগে থাকে, কিন্তু ব্যাপক আকার ধারণ না করলেও উক্ত রোগ ঐ স্থানে বৈশিষ্ট পূর্ণ বলে মনে হয় বা বৎসরে একটি বার দেখা দেয়, তখন তাকে এনডেমিক বলা হয়।	১	যখন কোন সংক্রামক রোগ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দেশ ছড়িয়ে পড়ে বা সারা পৃথিবী ব্যাপিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন তাকে প্যানডেমিক বলা হয়।
ইহা নির্দিষ্ট একটি এলাকার জনগোষ্ঠির মধ্যে দেখা যায়।	২	ইহা এক দেশ, জাতি, উপমহাদেশ ও মহাদেশ এ সংক্রমিত হয় বা প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।
উদাহরণ ঃ কোন একটি এলাকার জনগোষ্ঠি গলগন্ড, উদরাময় বা কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়া।	৩	উদাহরণ ঃ কোন একটি দেশ, জাতি বা মহাদেশ ইত্যাদি জুড়ে বিস্তার লাভ করে। যেমন- ইনফ্লুয়েঞ্জা, এইডস ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়
মহামারী রোগের বৈশিষ্ট্য
7. Ecological conditions and Epidemiological concepts

১। প্রশ্ন ঃ মহামারী বিদ্যা কাকে বলে ?

মহামারী বিদ্যা (Epidemiolog) ঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় মহামারী রোগের কারণ, সংক্রমণ প্রণালী, নিবারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে মহামারী বিদ্যা বলে।

২। প্রশ্ন ঃ মহামারী রোগ কাকে বলে। ইহা কি কারণে সংঘটিত হয় ?

মহামারী রোগ ঃ

যে সকল রোগ কোন উত্তেজক কারণে বিশেষ জনপদে ব্যাপকভাবে এক সাথে বহুলোকের সমাগম স্থলে আবির্ভাব হয় ও স্পর্শ সংক্রামক রূপ ধারণ এবং আক্রান্ত করে, তাকে মহামারী রোগ বলে। যেমন - উদরাময়, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি।

মহামারী রোগ সংঘটিত হওয়ার কারণ ঃ

ক। মূলকারণ - সোরা

খ। উত্তেজক কারণ –

(i) স্থানীয় পানি ও মৃত্তিকার দূষিত হওয়া কারণে।

(ii) বায়ুর দূষিত প্রভাব।

(iii) যুদ্ধের হত্যাকান্ড ও ধ্বংসের পর।

(iv) জলপ্লাবনে বা দূর্ভিক্ষের ফলে অনাহারাদি।

(v) ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাসসহ বিভিন্ন মাইক্রোঅর্গানিজম যা মহামারী রোগের অন্যতম কারণ।

(vi) পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতার অভাব।

৩। প্রশ্ন ঃ ইকোলজি কাকে বলে ?

ইকোলজি (Ecology) ঃ

জীব ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক বিজ্ঞানকে ইকোলজি বলে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ইকোলজি দ্বারা বুঝানো হয় যে, মানুষ যে পরিবেশে বসবাস করে সে পরিবেশের প্রভাব তাঁর শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রতিকুল প্রভাব মানুষের শরীর ও মনের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

৪। প্রশ্ন ঃ মহামারী রোগ কি ? বাংলাদেশের ৩টি মহামারী রোগের নাম লিখ ? ০৯

বা, মহামারী রোগ বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশের তিনটি মহামারী রোগের নাম লিখ।

মহামারী রোগ (Epidemic) ঃ

কোন সংক্রামক রোগ কোন এলাকায় অল্প সময়ে বহু লোককে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত করে, তাকে মহামারী রোগ বলে। এই রোগ হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইহা বিনা চিকিৎসায় নির্দিষ্ট সময় পরে সেরে যায় বা রোগীর মৃত্যু ঘটায়। সাধারণতঃ স্থানীয় পানি ও মৃত্তিকার দোষে দূষিত বায়ুর প্রভাবে দূর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, প্লাবন প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রধাণতঃ তিনটি মহামারী রোগের নাম নিম্নরূপ ঃ

(i) কলেরা। (ii) হাম। (iii) বসন্ত।

৫। প্রশ্ন ঃ পূনর্বাসন কাকে বলে ?

পূনর্বাসন এর সংজ্ঞা ঃ

মেডিকেল, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং বৃত্তিমূলক পদ্ধতির সম্মিলিতভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে একজন মানুষকে প্রশিক্ষন দিয়ে তার কাজ করার ক্ষমতাকে পূনরায় ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াকেই পূনর্বাসন বলে।

৩। প্রশ্ন : মহামারী বলতে কি বুঝ ? কিভাবে মহামারী প্রতিরোধ করা সম্ভব ? ১০, ১২, ১৫

মহামারী রোগ (Epidemic) :

কোন সংক্রামক রোগ যখন একসাথে অল্প সময়ে বহু লোককে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত করে, তাকে মহামারী রোগ বলে। এই রোগ হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ইহা বিনা চিকিৎসায় নির্দিষ্ট সময়ে পার হয়ে যায় বা রোগীর মৃত্যু ঘটায়। সাধারণত স্থানীয় পানি ও মৃত্তিকার দোষে দূষিত বায়ুর প্রভাবে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, প্লাবন প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

নিম্নলিখিতভাবে মহামারী প্রতিরোধ করা সম্ভব :

মহামারী রোগ সংক্রমন প্রতিরোধ করতে পারলে সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারবে না এবং কেউ রোগাক্রান্ত হবে না। তাই মহামারী রোগ যেন ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নিম্নে প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলি দেয়া হল :

১। **বিজ্ঞপ্তিকরণ (Notification) :** কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, টাইফয়েড ইত্যাদি গুরুতর রোগ দেখা মাত্র স্বাস্থ্য বিভাগকে সংবাদ দিতে হবে। জনস্বাস্থ্য বিভাগ সাথে সাথে রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করলে সংক্রামণের ব্যাপকতা থেকে জনগোষ্ঠী রক্ষা পাবে।

২। **স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation) :** সংক্রমিত রোগীকে আলো বাতাস পূর্ণ আলাদা ঘরে রাখতে হবে এবং অবাধ মেলা মেশা বন্ধ করতে হবে। কেবল মাত্র ডাক্তার ও সেবিকা স্বাস্থ্য সম্মত নিয়ম পালন করে দেখাশুনা করবে অথবা হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভর্তি করে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। **সঙ্গরোধকরণ (Quarantine) :** রোগীর সংস্পর্শে আসা অথবা একই বাড়িতে বসবাস অন্যদের মধ্যে ইতি মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করেছে

মনে হলে তাদেরকে অন্য লোকদের সংঙ্গে মেলামেশা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। যে পর্যন্ত না রোগের সর্বোচ্চ সুপ্তিকাল অতিবাহিত হয় ইহাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক। যে গৃহে সংক্রামণ হয়েছে তাদের সুপ্তিকাল উত্তীর্ণ পর্যন্ত জন সাধারণের সাথে মিশতে না দেওয়া।

খ। সংক্রামক ব্যাধির এলাকা হতে ছাত্রদের স্কুলে আসা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

গ। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেন সংক্রামণ ছড়াতে না পারে তাই সংক্রমিত দেশের পর্যটকদের অন্যদেশের সরকার বিধি আরোপ করেন।

৪। বিশোধন (Disinfection) ঃ রোগ জীবাণু ধ্বংস করার পদ্ধতিকেই বিশোধন বলা হয়। বিশোধন তিন পদ্ধতিতে করা যায়।

ক) প্রাকৃতিক উপায় ঃ সূর্যকিরণ ও বায়ু দ্বারা।

খ) উত্তাপ দ্বারা ঃ পুড়িয়ে, গরম পানিতে ফুটিয়ে, উত্তপ্ত বায়ু বা বাষ্প দ্বারা।

গ) রাসায়নিক উপায়ে ঃ রাসায়নিক পদার্থ যা জীবাণু বিনষ্ট করে কিন্তু জিনিস পত্র নয়। যেমন- চুনাপাথর, ব্লিচিং পাউডার, ফরমালিন, ফিনাইল, ডেটল ইত্যাদি।

৫। দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ টিকা দান কর্মসূচী গ্রহনের মাধ্যমে সংক্রামক রোগ নিবারণ করা যায়।

৬। স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ঃ রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পোষ্টার ও বক্তৃতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭। স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা (Sanitation) ঃ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

উপরিউক্ত মাধ্যমে সংক্রামন ব্যাধি অনেকাংশে দূর করা সম্ভব।

৭। প্রশ্ন ঃ মহামারী ও বিক্ষিপ্ত রোগের কারণ ও বৈশিষ্ট্য লিখ।

মহামারী রোগের কারণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ

কারণঃ (i) সোরার সাময়িক উচছাস।

(ii) সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহের সময় পরিবেশ দূষিত হবার কারণে।

(iii) ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ক্ষরা ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রভৃতি কারণে।

(iv) দূর্ভিক্ষ ও সামাজিক অনাচার প্রভৃতি।

(v) ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাসসহ বিভিন্ন মাইক্রোঅর্গানিজম যা মহামারী রোগের অন্যতম কারণ।

মহামারী রোগের বৈশিষ্ট্য ঃ (i) মহামারী রোগ সংক্রামক রোগ।

(ii) ইহা কোন অঞ্চলে হঠাৎ আবির্ভাব হয়।

(iii) রোগের লক্ষণ ও চিহ্ন দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

(iv) রোগীকে দ্রুত মৃত্যু মুখে পতিত করে।

(v) রোগের ভোগকাল নির্দিষ্ট, ভোগকাল শেষে হয় রোগী মৃত্যুবরণ করে না হয় রোগ নিজেই ধবংস হয়।

(vi) উদাহরণ- কলেরা, বসন্ত, হাম ইত্যাদি।

বিক্ষিপ্ত রোগের কারণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ

যে রোগসমূহ উত্তেজক কারণ বা অদৃশ্য কারণ হতে উৎপন্ন এবং এক এক স্থানে দুই একটি ব্যক্তির মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে আক্রান্ত হয়, তাকে বিক্ষিপ্ত রোগ বলে।

বিক্ষিপ্ত রোগ সোরার সাময়িক উচছাস এবং স্থানীয় জলবায়ু, মাটি, আকাশ ও পার্থিব প্রভাবে কিংবা স্বাস্থ্য হানিকর পদার্থ সমূহ দ্বারা দূরে দূরে এক একটি করে অনেক লোককে একই সময়ে আক্রমন করে। যেমন ঃ দুই এক দিনের জ্বরে কতগুলো লোক মারা গেল কি হঠাৎ পেট ফুলে উঠে দূরে দূরে কতগুলি লোক ভুগল ইত্যাদি। এ সকল রোগের কোন বিশেষ নাম নাই। হঠাৎ জ্বরে মারা গেল, হঠাৎ কলেরা হয়ে কয়েক জন লোক ভুগল বা মারা গেল ইত্যাদি।

৭। প্রশ্ন ঃ বিক্ষিপ্ত রোগের বৈশিষ্ট্য লিখ।

বিক্ষিপ্ত রোগের বৈশিষ্ট্য ঃ

যে সকল রোগসমূহ উত্তেজক কারণ বা অদৃশ্য কারণ হতে উৎপন্ন এবং এক এক স্থানে দুই একটি ব্যক্তির মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে আক্রান্ত হয়, তাকে বিক্ষিপ্ত রোগ বলে। এ রোগ স্থানীয় জলবায়ু, মাটি, আকাশ ও পার্থিব প্রভাব কিংবা স্বাস্থ্য হানিকর পদার্থ সমূহ দ্বারা দূরে দূরে এক একটি করে অনেক লোককে একই সময়ে আক্রমণ করে। যেমন ঃ দুই এক দিনের জ্বরে কতগুলো লোক মারা গেল, হঠাৎ পেট ফুলে উঠে দূরে দূরে কতগুলি লোক ভুগল ইত্যাদি। এ সকল রোগের কোন বিশেষ নাম নাই। হঠাৎ জ্বরে মারা গেল, হঠাৎ পাতলা পায়খানা ও বমি হয়ে কয়েকটি লোক ভুগল বা মারা গেল। কেই বলল কলেরা, কেউ বলল ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি।

১২। প্রশ্ন ঃ রোগের টারশিয়ারী প্রতিরোধ স্তরটির বর্ণনা কর।

টারশিয়ারী প্রতিরোধ (Tertiary Prevention) ঃ

(i) বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন ঃ পেশা পরিবর্তন ও উপযুক্ত পেশা নির্বাচন এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মের সময় নির্ধারণ করতে হবে।

(ii) সামাজিক পূনর্বাসন ঃ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক পূর্ণরুদ্ধার। ফলে এর উপর দেহ ও মনের সুস্থ্যতা নির্ভরশীল।

(iii) মেডিকেল পূনর্বাসন ঃ পুঙ্গদের জন্য কৃত্রিম অঙ্গ, পূর্ণগঠনমূলক অস্ত্রোপচার, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) মনস্তাত্ত্বিক পুনর্বাসন ঃ ব্যক্তিগত অবস্থা, মর্যাদা এবং আত্মবিশ্বাস পূর্ণরুদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। প্রশ্ন ঃ মহামারী ও বিক্ষিপ্ত রোগের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। ০৮

মহামারী ও বিক্ষিপ্ত রোগের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা ঃ

মহামারী রোগ		বিক্ষিপ্ত রোগ
যে সকল রোগ কোন উত্তেজক কারণে বিশেষ জনপদে ব্যাপকভাবে এক সাথে বহুলোকের সমাগম স্থলে আবির্ভাব হয় ও সর্বত্র সংক্রামক রূপ ধারণ এবং আক্রান্ত করে, তাকে মহামারী রোগ বলে।	১	যে সকল রোগ কোন উত্তেজক কারণে বিশেষ জনপদে বিক্ষিপ্তভাবে এক সাথে কিছু লোকের সমাগম স্থলে আবির্ভাব হয় ও সর্বত্র সংক্রামক রূপ ধারণ করে এবং আক্রান্ত করে, তাকে বিক্ষিপ্ত রোগ বলে।
ইহা মহল্লা বা গ্রামের পর গ্রাম আক্রান্ত হয়।	২	ইহা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তিগন আক্রান্ত হয়।
ইহা পানিবাহিত ও বায়ুবাহিত উভয় কারণে হয় বা হতে পারে।	৩	ইহা বেশিভাগই বায়ুবাহিত কারণে হয় বা হতে পারে।
ইহা ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসসহ বিভিন্ন অনুজীব দ্বারা সংগঠিত হয়।	৪	ইহা ভাইরাসসহ বিভিন্ন অনুজীব দ্বারা সংগঠিত হয়।

৯। প্রশ্ন ঃ রোগের সেকেন্ডারী প্রতিরোধ স্তরটির বর্ণনা কর।

সেকেন্ডারী প্রতিরোধ (Secondary Prevention) ঃ

কোন রোগ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নির্ণয় করে রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে হ্রাস করার ব্যবস্থাকে সেকেন্ডারী প্রতিরোধ বলে। এজন্য ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগের আক্রমণে বাধা সৃষ্টি, তথ্য সংগ্রহ এবং রোগের আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। রোগ দেখা দিলে অর্থাৎ সূচনায় রোগ নির্ণয় করে সদৃশ লক্ষণ অনুসারে হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবস্থা করে এমনভাবে চিকিৎসা করতে হবে যাতে রোগ আর বৃদ্ধি না পায়।

১০। প্রশ্ন ঃ রোগ প্রতিরোধের স্তরসমূহ কি কি।

রোগ প্রতিরোধের স্তরসমূহ বর্ণনা ঃ রোগ প্রতিরোধের তিনটি স্তর। যথা-

(i) প্রাইমারী প্রতিরোধ (Primary Prevention)

(ii) সেকেন্ডারী প্রতিরোধ (Secondary Prevention)

(iii) টারশিয়ারী প্রতিরোধ (Tertiary Prevention)

১১। প্রশ্ন ঃ রোগের প্রাথমিক প্রতিরোধ স্তরটি বর্ণনা কর।

প্রাইমারী প্রতিরোধ (Primary Prevention) ঃ

স্বাস্থ্যের উন্নয়ন বিধান-স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ-

ক) সুষম খাদ্য গ্রহণ করে শারীরিক পুষ্টিসাধন করা।

খ) বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা।

গ) মলমূত্র অপসারণ এবং আবর্জনা দূরীকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা দ্বারা স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ) স্বাস্থ্য শিক্ষা গ্রহণ করা।

ঙ) নিয়মিত ব্যায়াম করা।

চ) স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

ছ) যৌন ও প্রজনন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

জ) জীবন যাপনের মান উন্নয়ন এবং মেডিক্যাল চেক আপ করতে হবে।

স্বাস্থ্য রক্ষার সুনির্দিষ্ট প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

ক) টিকা গ্রহণ।

খ) ইমিউনিটির জন্য সুনির্দিষ্ট পুষ্টিকর সামগ্রীর ব্যবহার।

গ) শ্রম শিল্পে ও পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ রক্ষা করা।

ঘ) দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পঞ্চম অধ্যায়

বায়ু সঞ্চালন

8. Sanitation: Environmental sanitation; international sanitary regulations, Sanitary latrine, Sanitary well, Tube well, water supply in town, Disposal of refuge and human excreta.

১। প্রশ্ন ঃ বায়ু সঞ্চালন বলতে কি বুঝ? সু-স্বাস্থের জন্য বায়ু সঞ্চালনের গুরুত্ব লিখ। ১০, ১২

বা, বায়ু সঞ্চালন বলতে কি বুঝ? সু-স্বাস্থ্যের জন্য বায়ু সঞ্চালনের গুরুত্ব কি ? ১৪

বা, ভাল স্বাস্থ্যের জন্য বায়ু সঞ্চালনের গুরুত্ব বর্ণনা কর। '১১

বায়ু সঞ্চালনের সংজ্ঞা ঃ

কোন আবদ্ধ স্থানে আর্দ্র, উষ্ণ এবং গতিহীন বায়ু অপসারণ করে তৎস্থলে শুষ্ক, শীতল, গতিশীল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করাকে, বায়ু সঞ্চালন বলে। অর্থাৎ কোন আবদ্ধ স্থানের শুষ্ক, শীতল এবং গতিশীল বায়ু আনয়ন বা চলাচল করাকে বায়ু সঞ্চালন বলে।

সু-স্বাস্থ্যের জন্য বায়ু সঞ্চালনের গুরুত্ব ঃ

ভাল স্বাস্থ্যের জন্য নির্মল বায়ু প্রয়োজন। তাই দূষিত বায়ু গ্রহনের দ্বারা যাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয় সেই জন্যে বায়ু সঞ্চালনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

নিম্নে বায়ু সঞ্চালনের গুরুত্ব আলোচনা করা হল ঃ

(i) বায়ু সঞ্চালন না থাকলে রোগীর হাঁচি, কাশি ও মলমূত্রের রোগ জীবাণু আবদ্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াবে। সুস্থ্য ব্যক্তি এই রোগ জীবাণূ পূর্ণ বায়ু গ্রহণ করে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হবে।

৩। প্রশ্ন ঃ স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর।

স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশের প্রভাব ঃ

স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। রৌদ্র, বায়ু, পানি, খাদ্য, ভূমি, বাসগৃহ, আচ্ছাদান এবং নানাবিধ উদ্ভিদ প্রাণী ইত্যাদি আমাদের পরিবেশের উপাদান। বায়ু ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। আবার দূষিত বায়ু গ্রহণ মৃত্যুর কারণও হতে পারে। কল কারখানা, কয়লার খনি, ইটের ভাটা, ঘরের উনান ইত্যাদি হতে নানা প্রকার গ্যাস, তুলা, পাটের আঁশ, ধূলিকণা ইত্যাদি বায়ুর সাথে মিশে বায়ু দুষিত করে। এই দূষিত বায়ু গ্রহণের ফলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। আবার রোগীর হাঁচি, কাশি ও মলমূত্রের রোগ জীবাণু বায়ুর সাথে মিশে বায়ু দূষিত করে। এই রোগ জীবাণু পূর্ণ বায়ু গ্রহণ করলে সুস্থ ব্যক্তি ঐসব রোগে আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে আবর্জনা ও মল-মূত্র দূরীকরণ না করলে উহা হতে দূর্গন্ধ বাহির হয়ে আবহাওয়াকে দূষিত করে এবং মন অশান্ত করে তোলে। কাজেই ইহা স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। পানির অপর নাম জীবন আবার দূষিত পানির মৃত্যুর কারণ। দূষিত পানি পান করলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগ হয়। ফলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ভূমি মানুষের আবাসস্থল। এই ভূমির পরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত না হলে নানা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ নিজের খাদ্য নিজে তৈরী করতে পারে না। তাই খাদ্যের জন্য অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। অসুস্থ অবস্থা হতে আরোগ্যের জন্য চাই ঔষধ। আর অধিকাংশ ঔষধই উদ্ভিদ হতে প্রস্তুত হয়।

কাজেই উক্ত আলোচনা হতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজ এবং জাতি বুঝতে পারে।

৫। প্রশ্ন ঃ বিশুদ্ধ পানি বলতে কি বুঝায় ? শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বর্ণনা কর। ০৮, ১৪, ১৬

বিশুদ্ধ পানির সংজ্ঞা ঃ

জীবাণুমুক্ত, স্বচ্ছ পরিষ্কার, গন্ধবিহীন, প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ পান করার উপযোগী পানিকে, বিশুদ্ধ পানি বা নিরাপদ পানি বলে।

শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ বর্ণনা ঃ

শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে ওয়াসা। ওয়াসা কর্তৃপক্ষ নদীতে কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করে উহাতে পানি আটকে রেখে পানিতে ভাসমান বড় ময়লাসমূহ থিতিয়ে গেলে ঐ পানিকে পাম্প এর সাহায্য নিকটে কয়েকটি বড় পাকা চৌবাচ্চায় ফেলা হয়। সেখানে পাথর, বালি প্রভৃতির মাধ্যমে পানি ছেঁকে ফিল্টার করার পর প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্লোরিন মিশিয়ে পানিকে বিশুদ্ধ করে ওয়াসার পাইপের মাধ্যমে সমস্ত শহরে সরবরাহ করা হয়। শহরের বিভিন্ন এলাকায় সংরক্ষিত টাংঙ্কির মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ীতে সরবরাহ পানি করা হয়।

৬। প্রশ্ন ঃ খাবার পানি বিশুদ্ধ করার সাধারণ পদ্ধতিগুলি কি কি? ১০, ১১, ১২

বা। খাবার পানি বিশুদ্ধ করতে তুমি কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে ?

খাবার পানি বিশুদ্ধ করার সাধারণ পদ্ধতিগুলি ঃ

মানবদেহ গঠনের অন্যতম উপাদান হল পানি। দেহে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ পানি থাকে। এক কথায় বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন। বিশুদ্ধ পানি পান না করলে মানুষের বিভিন্ন রকম পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন- আমাশয়, কলেরা, উদরাময়, কৃমি ইত্যাদি। তাই বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। খাবার পানি শহর ও গ্রামাঞ্চলে দুই স্থানেই বিশুদ্ধ করে পান করা হয়।

শহরাঞ্চলে খাবার পানি বিশুদ্ধ করার পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ
(i) ধীর বালি ফিল্টার।
(ii) দ্রুত বালি ফিল্টার।
(iii) পানি ফুটিয়ে (by boiling)

গ্রামাঞ্চলে পানি বিশুদ্ধ করার পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ ঃ
(i) পানি ফুটিয়ে (by boiling)
(ii) কলসী ফিল্টার পদ্ধতি। (iii) ফিটকিরি।
(iv) জীবাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা।
(v) জীবাণুনাশক ট্যাবলেট দ্বারা।

উপরিউক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে পানি বিশুদ্ধ করে পানি পানের উপযোগী করে তুলা হয়।

৭। প্রশ্ন ঃ মৃদুপানি ও খর পানি বলতে কি বুঝা ? ১১

মৃদু পানি (Soft water) ঃ

যে পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট বিদ্যমান থাকে না এবং সাবান ঘষলে সহজে ফেনা হয়, তাকে মৃদু পানি বলে।

খর পানি (Hard water) ঃ

যে পানিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট এবং ক্যালসিয়াম ও ক্লোরাইড জাতীয় লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং সাবান ঘষলে সহজেই ফেনা হয় না, তাকে খর পানি বলে।

৮। প্রশ্ন ঃ পানির খরতা দূরীকরণের পদ্ধতিগুলি লিখ। ১০, ১২

পানির খরতা দূরীকরণের পদ্ধতিগুলি ঃ

ক) অস্থায়ী খরতা দূরীকরণ ঃ (i) পানি ফুটিয়ে অস্থায়ী খরতা দূরীকরণ।
(ii) ক্লার্কের প্রক্রিয়া অস্থায়ী খরতা দূরীকরণ।

খ) স্থায়ী খরতা দূরীকরণ ঃ (i) সোডিয়াম কার্বনেট এর মিশ্রণ প্রক্রিয়া।
(ii) পারমিউটেড পদ্ধতি।

৯। প্রশ্ন ঃ পানির খরতা কত প্রকার ও কি কি ? বর্ণনা কর।

পানির খরতার প্রকারভেদ ঃ

পানির খরতা দুই প্রকার। যথা ঃ- ক) অস্থায়ী খরতা খ) স্থায়ী খরতা।

অস্থায়ী খরতা ঃ যে পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়ামের বাইকার্বনেট লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তাকে অস্থায়ী খরতা বলে।

স্থায়ী খরতা ঃ যে পানিতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগ্নেসিয়াম ক্লোরাইড বা সালফেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তাকে স্থায়ী খরতা বলে।

১০। প্রশ্ন ঃ খর পানি ব্যবহারের অসুবিধা কি কি ? বর্ণনা কর।

খর পানি ব্যবহারের অসুবিধা ঃ

(i) খর পানিতে অনেক খাদ্য দ্রব্য সহজে সিদ্ধ হয় না বলে রান্নায় অসুবিধা হয়।

(ii) ইহাতে ফেনা হয় না, তাই কাপড় পরিষ্কার করার সময় অতিরিক্ত সাবানের প্রয়োজন হয়।

(iii) ইহা পানের অযোগ্য।

(iv) বয়লারে খর পানি ব্যবহার করলে বয়লারের ভিতরে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট ও সালফারের স্তর পড়ে। ফলে ইহাতে অধিক তাপ প্রয়োগ করতে হয়।

১১। প্রশ্ন ঃ মৃদুপানি ও খর পানির মধ্যে পার্থক্য লিখ। ১৭

বা, মৃদুপানি ও খর পানির মধ্যে যে কোন পাঁচটি পার্থক্য লিখ। ০৮

মৃদু পানি ও খর পানির মধ্যে পার্থক্য ঃ

নিম্নে মৃদু পানি ও খর পানির মধ্যে পার্থক্য দেয়া হল ঃ

মৃদু পানি		খর পানি
মৃদু পানিতে সহজে সাবানে ফেনা হয়।	১	খর পানিতে সহজে সাবানে ফেনা হয় না।
এই পানিতে সকল খাদ্য দ্রব্য সহজেই সিদ্ধ হয়।	২	অনেক খাদ্য শস্য যেমন ছোলা, মুসুরী ডাল ইত্যাদি সহজেই সিদ্ধ হয় না। দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়, ফলে রান্নার অসুবিধা হয়।
ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বাই কার্বনেট, ক্লোরাইড ও সালফেড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে না।	৩	ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বাই কার্বনেট, ক্লোরাইড ও সালফেড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।
এই পানির বর্ণ ও গন্ধহীন। নিজস্ব কোন স্বাদ নাই।	৪	স্বাদ যুক্ত।
এই পানির ব্যবহারে বয়লারের টিউব দীর্ঘ দিন ভাল থাকে।	৫	বয়লারে ব্যবহারের ফলে টিউবের গায়ে ঈধ, গম এর বাই কার্বনেট এর স্তর পড়ে ফলে অত্যধিক তাপের প্রয়োজন হয় এবং দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়।
কোন ভেষজ গুণ নাই বিধায় উৎকৃষ্ট ভেষজবহ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।	৬	অন্যগুণ বর্তমান থাকা অবস্থায় ভেষজবহ ব্যবহৃত করা হয় না।

১২। প্রশ্ন ঃ পল্লী অঞ্চলে মল-মূত্র দূরীকরণ ও নিষ্পত্তিকরণের উপায় লিখ। ১৪

বা পল্লী অঞ্চলে মলমূত্র দূরীকরণ ও নিষ্পত্তিকরণের সাধারণ উপায়সমূহ বর্ণনা কর। ০৮, ১০

পল্লী অঞ্চলে মলমূত্র দূরীকরণ ও নিষ্পত্তিকরণের সাধারণ উপায়সমূহ বর্ণনা ঃ

(i) পল্লী অঞ্চলে আবর্জনা নিষ্পত্তি করার দায়িত্ব প্রত্যেক পরিবারের উপর ব্যক্তিগতভাবে ন্যাস্ত ।

(ii) ইহার আবর্জনা পোড়া দিয়ে, গর্ত করে মাটিতে পুতে নিষ্পত্তিকরণ করা যায়।

(iii) ডোবা, গর্ত, নিচু জমি ভরাট করে আবর্জনা নিষ্পত্তি করতে হবে।

(iv) আবর্জনার সাথে গোবর মিশিয়ে কম্পোষ্টিং সার তৈরি করা যায়, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে না অথচ উত্তম প্রাকৃতিক সার উৎপন্ন হয়।

(v) ঘরে ব্যবহৃত পানি ও অন্যান্য তরল আবর্জনা ও কঠিন আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।

(vi) বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য কাঁচা বা পাকা পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা করতে হবে।

(vii) কুপ ও গভীর নলকুপ প্রভৃতির সাথে পাকা পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪। প্রশ্ন ঃ "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল"–কথাটি বুঝিয়ে লিখ। ১৫, ১৬

"স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল"–বর্ণনা ঃ

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি সমাজ ও দেশের সম্পদ। স্বাস্থ্য বলতে সাধারণতঃ শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাকে বুঝায়। শরীর ও মনের সুস্থ্যতা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলসুর "রোগ আরোগ্যের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা উত্তম"। স্বাস্থ্য মানুষের অত্যাবশকীয় একটি মৌলিক অধিকার যার গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ ও দেশের উন্নয়নের জন্য জনগণের সুস্বাস্থ্যেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই সুস্বাস্থ্য সমাজ ও দেশের মানুষের উন্নতি সাধন সম্ভব। স্বাস্থ্যই মানবদেহকে পরিচালনা করে। সুস্বাস্থ্যের দ্বারা মানুষ সর্বপ্রকার কার্য সম্পাদন করে। স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই কোন সুফল পাওয়া যায় না। মানুষের শরীরের সংগে সুস্বাস্থ্য সম্পর্ক নিবিড়। দেহ সুস্থ না থাকলে মন যেমন- সাচ্ছন্দ্য হারায়, তেমনি অসুস্থ মনের অধিকারী তার দৈহিক স্বাস্থ্যকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং সুখী জীবন ও সুখী সমাজ গড়ে তোলার জন্য স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৫। প্রশ্ন ঃ "রোগ আরোগ্যের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা উত্তম"- ব্যাখ্যা কর।

"রোগ আরোগ্যের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা উত্তম"- ব্যাখ্যা ঃ

রোগের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের বিকৃতি ঘটে, দূর্ভোগে ভুগতে হয়। সংক্রামক রোগসমূহ এক ব্যক্তি হতে অন্য ব্যক্তির মধ্যে

সংক্রামিত হয়ে মহামারী সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে বহু লোকে মৃত্যু হতে পারে। রোগাক্রান্ত হলে অনেকে অর্থাভাবে চিকিৎসা করতে পারে না। ফলে অনেকেরই অকাল মৃত্যু ঘটে। আর যদি আমরা পূর্ব হতে রোগ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারি তা হলে আমরা রোগে আক্রান্ত হব না।

১৬। প্রশ্ন ঃ স্যানিটেশন কি? পানির উৎসগুলোর নাম লিখ। ১৭

স্যানিটেশন ঃ

স্যানিটেশন অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত নিরাপদ জীবন-যাপন প্রণালী। দি ন্যাশনাল স্যানিটেশন ফাউন্ডেশন অব দি ইউ.এস.এ কর্তৃক স্যানিটেশনের সংজ্ঞা বলতে- সুস্থ্য জীবন ধারনের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর-বাড়ী, চিন্তা মুক্ত জীবন-প্রণালী, কোলহলমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন কমিউনিটি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনে সুখ-শান্তি, সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে সুসম্পর্ক ও সামাজিক মূল্যবোধের জ্ঞান কে বুঝায়।

পানির উৎসগুলোর নাম ঃ

পানির উৎসগুলোর নাম হচ্ছে- বৃষ্টির পানি, খাল-বিল, নদী-নালা, সমুদ্র, গভীর নলকুপ, পুকুর, ট্যাংক ইত্যাদি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদ্য ও পুষ্টি (Nutrition and food)

১। প্রশ্ন ঃ খাদ্য বলতে কি বুঝ ? ইহার শ্রেণী বিভাগ কর ? ০৯, ১৬

খাদ্য (Defination of Food) ঃ যে সকল পদার্থ মানবদেহে শোষিত হয়ে দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, পুষ্টি সাধন, স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষা, কর্মশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তাকে খাদ্য বলে।

খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ (Classification of food) ঃ

খাদ্যকে প্রধানতঃ ৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

(i) শক্তি উৎপাদক খাদ্য ঃ এরা শর্করা ও চর্বি সমৃদ্ধ খাদ্য। যেমন- চাল, গম, চিনি ইত্যাদি।

(ii) দেহ গঠনকারী খাদ্য ঃ এরা আমিষ সমৃদ্ধ খাদ্য। যেমন- মাছ, মাংস, কলিজা, দুধ, ডাল ইত্যাদি।

(iii) প্রতিরোধ মূলক খাদ্য ঃ এটি আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ খাদ্য। যেমন- দুধ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি।

উৎস অনুসারে খাদ্যেকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

(i) প্রাণীজ খাদ্য উপাদান এবং

(ii) উদ্ভিদজ খাদ্য উপাদান।

রাসায়নিক গঠন অনুসারে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ ঃ

(i) প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য (Protein)।

(ii) কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য (Carbohydrate)।

(iii) ফ্যাট বা চর্বি বা স্নেহজাতীয় (Fat)।

(iv) ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ (Vitamin)।

(v) মিনারেলস বা লবণ জাতীয় খাদ্য (Minerral)।

(vi) পানি (Water)|

২। প্রশ্ন ঃ খাদ্যও পুষ্টি সম্পর্কে লিখ। ১২

খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা ঃ

খাদ্য ও পুষ্টি একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খাদ্যের মধ্যে পুষ্টি সঞ্চিত থাকে আর অপরদিকে পুষ্টি ছাড়া খাদ্য মূল্যহীন। খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হল ঃ

খাদ্য (Food) ঃ

যে সকল পদার্থ মানবদেহে শোষিত হয়ে দেহের বৃদ্ধি ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন, স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষা, কর্মশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তাকে খাদ্য বলে। বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক জীবেরই খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। ইহার ৩টি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। যেমন ঃ-

(i) শরীরের পুষ্টি সাধন ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনের জন্য।

(ii) শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা রক্ষা করার জন্য এবং কর্মশক্তি বাড়ানোর জন্য।

(iii) শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি উৎপাদন এবং শরীর সুস্থ্য রাখার জন্য খাদ্যের দরকার।

পুষ্টি (Nutrition) ঃ

দেহের বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খাদ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করাকে পুষ্টি বলে।

(i) পুষ্টি দেহের ক্যালরির চাহিদা পূরণ করে।

(ii) পুষ্টি দেহকে বিভিন্ন অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা করে।

(iii) দেহের সুন্দর কাঠামো প্রদান করে।

(iv) দেহকে স্থুলতা থেকে রক্ষা করে।

(v) পুষ্টি ব্যক্তিকে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, খাদ্য ও পুষ্টি একটি অন্যটির পরিপূরক। মানবদেহকে সুস্থ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য খাদ্য ও পুষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম।

৩। প্রশ্ন ঃ কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের উৎস কি কি ?

কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের উৎস ঃ

উদ্ভিদ হতে প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পাওয়া যায়। চাল, আটা, আলু, ডাল, চিনি, মধু, মিষ্টি ফল ইত্যাদি। প্রাণীজ উৎস ঃ দুধ।

৪। প্রশ্ন ঃ কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের কাজ লিখ।

কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের কাজ ঃ

(i) কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অক্সিজেনের সাহায্যে মেটাবলিজম হয়ে দেহে তাপ ও কর্মশক্তি উৎপন্ন করে।

(ii) ইহা দেহের আমিষের ক্ষয় নিবারণ করে।

(iii) ইহা চর্বিকে বহন করে।

(iv) প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ চর্বিতে পরিণত হয়ে শরীরে জমা হয় ও মেদ বৃদ্ধি করে।

(v) ইহা শরীরের ওজন বৃদ্ধি করে।

(vi) ইহা স্নায়ুকোষের একমাত্র শক্তির উৎস।

(vii) ইহা চর্মের কোমলতা রক্ষা ও লাবণ্যতা বৃদ্ধি করে।

(viii) ইহা মিউকাস মেমব্রেনের আবরণ রক্ষা করে।

(ix) এ জাতীয় খাদ্যে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে।

(x) ইহা দেহে হরমোন উৎপাদনে সাহায্য করে।

৫। প্রশ্ন ঃ কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের অভাবজনিত রোগ কি কি?

কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের অভাবজনিত রোগ ঃ

(i) দুর্বলতা,

(ii) কোষ্ঠকাঠিন্যতা ও

(iii) চর্মের মসৃণতা নষ্ট হয়।

৬। প্রশ্ন ঃ ফ্যাট বা চর্বি বা স্নেহজাতীয় উৎস কি কি?

ফ্যাট বা চর্বি বা স্নেহজাতীয় উৎস ঃ

প্রাণীজ খাদ্য ঃ ঘি, মাখন, পনির, চর্বি, ডিম, মাংস ও মাছের তৈল।

উদ্ভিজ খাদ্য ঃ সরিষা তৈল, তিলের তৈল, বাদাম তৈল, নারিকেল তৈল, জলপাইয়ের তৈল, সয়াবিন তৈল ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকারের তৈল বীজেও স্নেহজাতীয়।

৭। প্রশ্ন ঃ ফ্যাট বা চর্বি বা স্নেহজাতীয় কাজ লিখ।

ফ্যাট বা চর্বি বা স্নেহজাতীয় কাজ ঃ

(i) ইহা শরীরে অক্সিজেনের সহযোগে মেটাবলিজম হয়ে এনার্জি ও তাপ উৎপন্ন করে।

(ii) ইহা চর্মের কোমলতা বৃদ্ধি করে।

(iii) ইহা দেহে মেদ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

(iv) ইহা দেহাভ্যন্তরের মিউকাস মেমব্রেনের আবরণরূপে এদেরকে রক্ষা করে।

(v) ইহা দেহের আমিষকে ক্ষয় হতে রক্ষা করে।

(vi) ফ্যাট- এ দ্রবীভূত ভিটামিনসমূহকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে। যেমন- ভিটামিন- এ, ডি, কে, ই।

৮। প্রশ্ন ঃ ফ্যাট বা চর্বি বা স্নেহজাতীয় অভাবজনিত এবং অতিরিক্ত গ্রহনের ফলে রোগ কি কি হয়?

ফ্যাট বা চর্বি বা স্নেহজাতীয় অভাবজনিত রোগ ঃ

(i) চর্মের মসৃণতা নষ্ট হয়।

(ii) শরীরের তাপমাত্রহ্রাস পায়।

(iii) দেহের বৃদ্ধিহ্রাস পায়।

ফ্যাট বা চর্বি বা স্নেহজাতীয় অতিরিক্ত গ্রহনের ফলে রোগ ঃ

(i) মেদাধিক্য (Obesity)।

(ii) করোনারী হার্ট ডিজিজ (Coronary heart disease)।

(iii) ক্যান্সার অব কোলন এবং ব্রেষ্ট (Cancer of colon and breast)।

৯। প্রশ্ন ঃ আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎসসমূহ কি কি ?

আমিষ জাতীয় খাদ্য ঃ

সুষম খাদ্য তালিকায় একটি অপরিহার্য খাদ্য উপাদান হল আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। এ জাতীয় খাদ্য প্রাণীজ ও উদ্ভিদজ্জ দুই প্রকার উৎস থেকেই পাওয়া যায়।

ক। প্রাণীজ উৎস ঃ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা ইত্যাদি।

খ। উদ্ভিদজ্জ উৎস ঃ নানা প্রকার ডাল, (বুট, মুগ, মুশুরী) সিমবীজ, সয়াবিন, মঠরশুটি, নানা প্রকার ফল, কলা, আম, কাঁঠাল, চাউল, গম ইত্যাদি।

১১। প্রশ্ন ঃ দেহে খাদ্য উপাদান খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ঃ

দেহ গঠনে ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণে খাদ্য উপাদান পদার্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যেই খনিজ পদার্থ বেশী থাকে। প্রতিদিন মলমূত্র ও ঘামের সঙ্গে কিছু কিছু খনিজ পদার্থ বাহির হয়ে যায়। প্রতিদিনের খাদ্য দ্বারা এই অভাব পূরণ করতে হয়। দেহের খনিজ লবণগুলি মৌলিক খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

খনিজ পদার্থে দেহ গঠন করে ঃ

(i) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাঁড় ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে। দাঁতের শক্ত আবরণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগ্নেসিয়াম দিয়ে তৈরী। দাঁতে অল্প পরিমাণে ক্লোরিন থাকে।

(ii) লৌহ ও ফসফরাস মাংসপেশী, গ্রন্থি ও স্নায়ূকোষ এবং বিভিন্ন কোষ গঠন করে।

(iii) লৌহ ও তামা রক্তের হিমোগ্লোবিন গঠন করে।

(iv) গন্ধক আমাদের চুল, নখ ও চর্মের গঠন এবং পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়।

(v) বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দেহের নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থিরস উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। যেমন- আয়োডিন, থাইরয়েড গ্রন্থির রস থাইরক্সিন প্রস্তুতে সাহায্য করে। ক্লোরিন পাকস্থলীর রস এবং সোডিয়াম অন্ত্রের রস প্রস্তুতে সাহায্য করে।

আভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণে ঃ-

(i) খনিজ পদার্থ রক্ত ও শরীরের অন্যান্য তরল পদার্থের মধ্যে চাপের সমতা বজায় রেখে দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখে।

(ii) সোডিয়াম ও পটাসিয়াম দেহের দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
(iii) খনিজ পদার্থ প্রোটিন দ্রবণে সাহায্য করে।
(iv) ক্যালসিয়াম রক্ত জমাট বাঁধার কাজে সাহায্য করে।
(v) খনিজ পদার্থ দেহের অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে।
(vi) আয়োডিন দেহের বিপাকে সাহায্য করে।
(vii) ম্যাগ্নেসিয়াম এনজাইমের বিপাকে সাহায্য করে।
(viii) কোবাল্ট ভিটামিন বি১২ এর প্রধান উপাদান। মানব দেহের রক্ত কোষ গঠনে ভিটামিন বি১২ এর বিশেষ প্রয়োজন।
(ix) দস্তা জারক রস প্রস্তুতে সাহায্য করে।
(x) ক্লোরিন পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরী করে পরিপাকে সাহায্য করে।

১২। প্রশ্ন ঃ খাদ্যের কাজ কি কি ? বা খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা লিখ।
খাদ্যের কাজ ঃ
(i) শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনের কাজ করে।
(ii) শরীরের ক্ষয় পূরন করে।
(iii) শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ঠিক রাখে।
(iv) শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখার জন্য
(v) দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন।

১৩। প্রশ্ন ঃ পুষ্টি বলতে কি বুঝ? খনিজ লবণের উৎস লিখ। ০৮, ১০ ১৫

পুষ্টির সংজ্ঞা ঃ

দেহের বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য খাদ্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাদান সরবরাহ করাকে, পুষ্টি বলে।

খনিজ লবণের উৎস ঃ সামুদ্রিক পানি

১৪। প্রশ্ন ঃ আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীতা লিখ ? ১৬

আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীতা ঃ

মানবদেহ গঠনের প্রধান উৎস হল আমিষ জাতীয় খাদ্য।

(ক) ইহা দেহ কোষ বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণ করে থাকে। ইহা দেহের পুষ্টি সাধন ও হরমোন উৎপাদন করতে সাহায্য করে।

(খ) ইহা রক্তের অসমোটিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্ত জমাট বাধতে সাহায্য করে।

(গ) ইহা কতকগুলো জারক রস তৈরী করে দেহের কর্মশক্তি ও পেশীশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(ঘ) ইহার অভাবে নানা রকম রোগ দেখা দেয়। যেমন–

(i) শিশুদের শুকিয়ে যাওয়া, রক্তস্বল্পতা এবং ফুলে যাওয়া।

(ii) কর্মে উৎসাহ ও উদ্দীপনা থাকে না।

(iii) দেহে প্রোটিনের পরিমাণ কম থাকলে টিস্যু বৃদ্ধি হয় না আর সেজন্য ওজন কমতে থাকে।

(iv) রক্তস্বল্পতা, অজীর্ণ ও ম্যারাসমাস প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

উপরিউক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মানবদেহ গঠনের জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১৫। প্রশ্ন ঃ আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাবে কি কি রোগ হয় ?

আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাবে নিম্নলিখিত রোগ হয় ঃ

(i) এনিমিয়া,

(ii) ইডিমা,

(iii) ইনডাইজেশন,

(iv) কোয়াশিরকর,

(v) ম্যারাসমাস।

১৬। প্রশ্ন ঃ পুষ্টি হিসাবে স্নেহ ও তৈল জাতীয় খাদ্যের গুরুত্ব লিখ।

পুষ্টি হিসাবে স্নেহ ও তৈল জাতীয় খাদ্যের গুরুত্ব ঃ

(i) স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে শক্তি উৎপাদনকারী উপাদান বলা হয়।

(ii) ইহাতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে।

(iii) ইহা অক্সিজেনের সহায়তায় মেটাবলিজম হয়ে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে।

(iv) ইহা খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে, খাদ্যকে সুস্বাদু করে।

(v) ইহা দেহের প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপাদন করে।

(vi) ইহা চর্মের কোমলতা রক্ষা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

(vii) ইহা দেহাভ্যন্তরে মিউকাস মেমব্রেনের আবরণ রূপে এদের রক্ষা করে

১৭। প্রশ্ন ঃ লবণ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা লিখ। ১০, ১৫

লবণ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ঃ

(i) আয়োডিন থাইরয়েড হরমোন থাইরক্সিন ও ট্রাই-আয়োডো থাইরোক্সিন উৎপাদন করে।

(ii) ইহা হাইপোথাইরয়েডিজম রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

(iii) জিংক প্রোটিন মেটাবলিজম করে এবং প্যানক্রিয়াসে ইনসুলিন উৎপাদনে সাহায্য করে।

(iv) ইহা রোগ প্রতিরোধে জীবনীশক্তিকে সহাযোগিতা করে।

(v) সোডিয়াম রক্তের অসমোটিক প্রেসার ও টিস্যুর অন্যান্য ফ্লুইড নিয়ন্ত্রণ করে।

(vi) ইহা রক্তের P^H আয়ন নিয়ন্ত্রণ করে।

(vii) ম্যাগনেসিয়াম স্বাভাবিকভাবে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম মেটাবলিজম করে।

উপরিউক্ত কারণে লবণ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১৮। প্রশ্ন ঃ সুষম খাদ্য বলতে কি বুঝ ? ০৯, ১৬, ১৭
বা, সুষম খাদ্য কি ? এ সম্পর্কে বর্ণনা কর।

সুষম খাদ্য (Balance Diet) ঃ

দেহের প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণ মত সকল খাদ্যের উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যকে, সুষম খাদ্য বলে। পরিশ্রমী একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যহ ২৮০০-৩০০০ ক্যালরী যুক্ত উৎপাদক খাবার খাওয়া উচিত। সব ধরনের সুষম খাবারেই কোন না কোন পুষ্টি রয়েছে। আমিষ জাতীয় খাদ্য প্রধানতঃ দেহ গঠন ও ক্ষয় নিবারক। স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রধানত ঃ তাপ ও কর্ম শক্তির উৎপাদক। সুতরাং দেহে পুষ্টির জন্য এই তিন ধরনের খাদ্য খাওয়া আবশ্যক। এছাড়া প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকা আবশ্যক। এগুলোর সাথে পানিও থাকতে হবে। সুষম খাদ্য ছাড়া ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ থাকতে পারে না। কোন জাতীয় খাদ্য বেশী খেলে আবার কোনটা কম খেলে বা না খেলে সুষম খাদ্য হবে না। সুষম খাদ্য মানেই খাদ্যের যে ৬টি উপাদান রয়েছে তা পরিমিত পরিমাণে খাওয়াকেই বোঝায়। আর এজন্য ইংরেজীতে একে Balance Diet বলে। অর্থাৎ আমাদের প্রতিদিনের খাবারে সুষম মাত্রায় সব রকম খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ খাবার থাকতে হবে।

১৯। প্রশ্ন ঃ একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির সুষম খাদ্য তালিকা তৈরী কর।১৫, ১৬

সুষম খাদ্য (Balance Diet) ঃ

দেহের প্রয়োজন অনুসারে পরিমাণ মত সকল খাদ্যের উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

নিম্নে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির সুষম খাদ্যের তালিকা দেয়া হল ঃ

খাদ্য দ্রব্যের নাম	পরিমাণ
চাউল অথবা আটা	৫০০ গ্রাম।
ডাল	১০০ গ্রাম।
মাছ অথবা মাংস	১০০ গ্রাম।
তৈল, ঘি, মাখন	৭৫ গ্রাম।
দুধ	৩০০ মিলি।
শাক সবজি	১৫০ গ্রাম।

২০। প্রশ্ন ঃ দুধ একটি আদর্শ খাদ্য - যুক্তিসহ প্রমাণ কর। ১৭

দুধ একটি আদর্শ খাদ্য - যুক্তিসহ প্রমাণ ঃ

দুধে প্রচুর পরিমান আমিষ, শর্করা, ফ্যাট, খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি রয়েছে। দুধ অতি সহজে হজম হয়, রোগী, বয়স্ক ও শিশু সকল বয়সের লোকের জন্য ইহা অপরিহার্য। দেহের গঠন, পুষ্টিসাধন ও ক্ষয়পূরণ এবং বৃদ্ধিসাধনের জন্য যে সব উপাদানের প্রয়োজন তার সবগুলি দুধের মধ্যে বিদ্যমান। দুধ একটি অতি উৎকৃষ্ট পানীয় যার মধ্যে দেহের পুষ্টিসাধন করে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।

সুতরাং উপরিউক্ত কারণে দুধকে একটি আর্দশ খাদ্য বলা হয়।

২১। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন কি? ইহার শ্রেণীবিভাগ লিখ। ১৩, ১৭

ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) ঃ

ল্যাটিন শব্দ থেকে ভিটামিন শব্দের উৎপত্তি। Vita অর্থ জীবন আর Amine অর্থ হল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রকার রাসায়নিক মূলক দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জৈবিক কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদনসহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অতি প্রয়োজনীয় অল্প পরিমাণে খাদ্যে উপস্থিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ হল ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। অর্থাৎ খাদ্যের মধ্যে এমন কতগুলি উপাদান আছে, যা অল্প পরিমাণে দেহের প্রয়োজন এবং দেহের গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগে কিন্তু এদের কোন ক্যালরী শক্তি নাই। খাদ্যের ঐ বিশেষ উপাদানগুলিকে ভিটামিন বলে।

ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগ ঃ

দ্রবণীয়তা অনুসারে ভিটামিনকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ

(i) পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন ঃ বি$_১$ (থায়ামিন), বি$_২$ (রিবোফ্লাভিন), বি$_৩$ (নিকোটিন এসিড), বি$_৫$ (ফলিক এসিড), বি$_৬$ (ফলিক এসিড), বি$_{১২}$ (সায়ানো কোবালামিন), ভিটামিন সি।

(ii) চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিন ঃ ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, ভিটামিন কে।

২২। প্রশ্ন ঃ আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি লবণের নাম লিখ। ১০

আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পাঁচটি লবণের নাম ঃ

(i) সোডিয়াম ক্লোরাইড,

(ii) পটাসিয়াম ক্লোরাইড,

(iii) ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড,

(iv) সোডিয়াম সালফেট,

(v) এমোনিয়াম ক্লোরাইড।

২৩। প্রশ্ন ঃ ভিটামিনের শ্রেণীবিভাগ ও রিবোফ্লোভিনের অভাবজনিত রোগগুলোর বর্ণনা কর ?

ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) ঃ ল্যাটিন শব্দ থেকে ভিটামিন শব্দের উৎপত্তি। Vita অর্থ জীবন আর Amine অর্থ হল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রকার রাসায়নিক মূলক।

দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জৈবিক কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদনসহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অতি প্রয়োজনীয় স্বল্প পরিমাণে খাদ্যে উপস্থিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ হল ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।

দ্রবনীয়তা অনুসারে ভিটামিনকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

(i) পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন ঃ ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স- বি১ (থায়ামিন), বি২ (রিবোফ্লাভিন), বি৩ (নিকোটিন এসিড), বি৫ (ফলিক এসিড), বি৬ (ফলিক এসিড), বি১২ (সায়ানো কোবালামিন)। ভিটামিন- সি।

(ii) চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিন ঃ ভিটামিন- এ, ভিটামিন- ডি, ভিটামিন- ই, ভিটামিন- কে।

রিবোফ্লোভিন (Riboflavin/B_2) ঃ রিবোফ্লোভিন পানিতে দ্রবনীয় দীর্ঘক্ষণ রান্না করলে নষ্ট হয়ে যায়। গম, ছোলা, টমেটো, সবুজ শাক-সবজী, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতিতে ইহা পাওয়া যায়।

অভাব জনিত রোগ ঃ

(i) জিহ্বা, মুখে ও ঠোঁটের কোনে ঘা হয়।

(ii) চর্মে শুষ্কতা ও উদ্ভেদ ন্যায় দাগ হয়।

(iii) অকালে চুল উঠে যায়।

(iv) ক্ষুধাহীনতা।

(v) অবসন্নতা।

(vi) স্নায়ুবিক দুর্বলতা।

২৪। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন "ডি" এর উৎস, কাজ ও অভাবজনিত রোগের নাম লিখ। ১৩, ১৫, ১৬

ভিটামিন "ডি" এর উৎস, কাজ ও অভাবজনিত রোগের নাম ঃ

ভিটামিন "ডি" এর উৎস ঃ দুধ, মাখন, ডিম, ইলিশ মাছের তৈল, কড লিভার, তৈল, নারিকেল শাস, পশুর যকৃত, বিভিন্ন প্রকারের সামুদ্রিক মাছ প্রভৃতি খাদ্য এবং সূর্য কিরনের দ্বারা মানুষের দেহে ভিটামিন- 'ডি' স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়।

ভিটামিন "ডি" এর কাজ ঃ

(i) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ ক্রিয়াতে সাহায্য করে।

(ii) হাড় ও দাঁতের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

(iii) হাড় ও দাঁতের ক্ষয়রোধে সাহায্য করে।

(iv) বিভিন্ন প্রকার হাড়ের রোগ প্রতিরোধ করে।

ভিটামিন "ডি" এর অভাবজনিত রোগসমূহ ঃ

(i) শিশুদের রিকেট ও বড়দের অষ্টিওম্যালেসিয়া হয়।

(ii) অস্থি ও দাঁতের বিকৃতি গঠন।

(iii) অমসৃণ ত্বক।

(iv) ফুসফুসের নানা রকম রোগ দেখা দেয়।

(v) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিপাকে বিঘ্ন হয়।

২৫। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন কি ? ভিটামিন "এ" এবং "বি" এর উৎস লিখ।

ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) ঃ

ল্যাটিন শব্দ থেকে ভিটামিন শব্দের উৎপত্তি। Vita অর্থ জীবন আর Amine অর্থ হল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রকার রাসায়নিক মূলক। দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জৈবিক কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদনসহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অতি প্রয়োজনীয় স্বল্প পরিমাণে খাদ্যে উপস্থিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ হল ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।

ভিটামিন "এ" এবং "বি" এর উৎস ঃ

ভিটামিন "এ" এর উৎস ঃ

ভিটামিন "এ" চর্বিতে দ্রবনীয়। খাদ্যের সবুজ হলুদ রং এই ভিটামিনের বিশেষত্ব। মাছ, মাছের তৈল, যকৃত, পনির, ডিমের কুসুম, কমলা লেবু, লাল শাক, আলু, ভুট্টা, পালংশাক, বাঁধাকপি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" পাওয়া যায়।

ভিটামিন "বি" এর উৎস ঃ

(i) ঢেঁকিছাটা চালের উপর লাল রং এর পদার্থ।

(ii) সব রকম ডালের উপরিভাগের খোসায়।

(iii) আটার ভূষিতে,

(iv) পশু পাখির হৃদপিন্ডে ও যকৃতে

(v) ফুল কপি, বাধা কপি,

(vi) পালং শাক, ভুট্টা, আলু।

(vii) ভাতের মাড়।

(viii) দুধ, দই, ছানা, প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "বি" রয়েছে।

২৬। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন 'এ' ও 'বি' এর উৎস ও তাদের অভাবজনিত রোগের বর্ণনা দাও। ১১, ১২
বা, ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'বি' এর অভাবজনিত রোগসমূহ কি কি? ০৯

ভিটামিন "এ" এর উৎস ঃ

ভিটামিন "এ" চর্বিতে দ্রবনীয়। খাদ্যের সবুজ হলুদ রং এই ভিটামিনের বিশেষত্ব। মাছ, মাছের তৈল, যকৃত, পনির, ডিমের কুসুম, কমলা, লাল শাক, আলু, ভুট্টা, পালংশাক, বাঁধাকপি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" পাওয়া যায়।

অভাবজনিত রোগ ঃ

ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। রোগ প্রতিরোধ শক্তি হ্রাস পায়। ফলে নানা রকম রোগ হয়। যেমন ঃ-

(i) রাত কানা।
(ii) উদরাময়।
(iii) চর্ম শুষ্ক ও খসখসে হওয়া।
(iv) অস্থির অসামাঞ্জস্যতা দেখা দেয়।
(v) প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস।
(vi) দন্তক্ষয়।
(vii) শ্বাসতন্ত্রের রোগ প্রভৃতি।

ভিটামিন "বি" এর উৎস ঃ

(i) ঢেঁকিছাটা চালের উপর লাল রং এর পদার্থ।
(ii) সব রকম ডালের উপরিভাগের খোসায়।
(iii) আটার ভূষিতে,
(iv) পশু পাখির হৃদপিন্ডে ও যকৃতে
(v) ফুল কপি, বাঁধা কপি,

(vii) পালং শাক, ভুট্টা।
(viii) ভাতের মাড়।
(ix) আলু।
(x) দুধ, দই, ছানা প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "বি" রয়েছে।

অভাব জনিত রোগ ঃ

(i) বেরিবেরি।
(ii) পেলাগ্রা।
(iii) নার্ভসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে।
(iv) অকালে চুল পেকে যায়।
(v) হৃদপিন্ড প্রসারিত ও দুর্বল হয়।
(vi) পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা নষ্ট হয়।

২৭। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন "কে" -এর উৎস ও অভাবজনিত সমস্যাগুলো লিখ। ১৭

ভিটামিন "কে" -এর উৎস ঃ

(ক) গরুর দুধ, মায়ের দুধ।
(খ) তাজা গাঢ় সবুজ ভেজিটেবলস, যেমন - স্পিনাস, কলিফ্লাওয়ার, কেবেজ এবং কিছু ফলের মধ্যে।
(গ) দেহের ইনটেস্টাইনের ভিতরে থাকা ব্যাক্টেরিয়া ভিটামিন K2 উৎপাদনে সহায়তা করে।

ভিটামিন "কে" -এর অভাবজনিত সমস্যাগুলো ঃ

১. সাধারণত রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়া- হাইপোপ্রোথ্রোম্বিনিমিয়া।
২. ক্লটিং টাইম বৃদ্ধি পায়।

২৮। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন "সি" -এর উৎস ও কাজগুলো লিখ। ১৭

ভিটামিন 'সি' এর উৎস ঃ

সকল প্রকার টাটকা জাতীয় ফল, যেমন- আমড়া, কমলা লেবু, লেবু, টমেটো, জাম, কাঁচা তেঁতুল, আনারস, আঙ্গুর, মরিচ, টাটকা শাক-সবজি।

ভিটামিন 'সি' এর কাজ ঃ

(i) স্কার্ভি দাঁতের মাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে, অস্থি, দাঁত ও মাড়ি বিকৃতি রোধ করে।

(ii) ঘাড় এর দুর্বলতা প্রতিরোধ করে।

(iii) দাঁতের এনামেল এবং অকালে দাঁত পড়ে যাওয়া প্রতিরোধ।

(iv) সর্দি, কাশিসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগে প্রতিরোধ করে।

(v) ক্ষত আরোগ্যে সহায়তা করে।

(vi) দেহের ক্ষয় পুরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে।

২৯। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন "সি' এবং "ডি" এর উৎস ও অভাবজনিত রোগ লিখ?

বা, ভিটামিন "সি" এবং ভিটামিন "ডি" এর অভাবজনিত রোগসমূহের নাম লিখ। ০৯

ভিটামিন 'সি' এর উৎস ঃ

সকল প্রকার টাটকা জাতীয় ফল যেমন ঃ আমড়া, কমলা লেবু, লেবু, টমেটো, জাম, কাঁচা তেঁতুল, আনারস, আঙ্গুর, মরিচ, টাটকা শাকসবজি।

ভিটামিন 'সি' এর অভাবজনিত রোগসমূহ ঃ

(i) স্কার্ভি, দাঁতের মাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে, অস্থি, দাঁত ও মাড়ি বিকৃতি ঘটে।

(ii) ঘাড় দুর্বল হয়ে যায়।

(iii) দাঁতের এনামেল উঠে যায় এবং অকালে দাঁত পড়ে যায়।

(iv) সর্দি, কাশি ইত্যাদি রোগ লেগে থাকে।
(v) ক্ষত শুকাতে চায় না।
(vi) কর্মে উৎসাহ থাকে না।
(vii) ওজন হ্রাস পায় ইত্যাদি।

ভিটামিন "ডি" এর উৎস ঃ

দুধ, মাখন, ডিম, ইলিশ মাছের তৈল, কড লিভার, তৈল, নারিকেল শাস, পশুর যকৃত প্রভৃতি খাদ্য এবং সূর্য কিরনের দ্বারা মানুষের দেহে এই ভিটামিন স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়।

ভিটামিন "ডি" এর অভাবজনিত রোগসমূহ ঃ

(i) শিশুদের রিকেট ও বড়দের অষ্টিওম্যালেসিয়া হয়।
(ii) অস্থি ও দাঁতের বিকৃতি গঠন।
(iii) অমসৃণ ত্বক।
(iv) ফুসফুসের নানা রকম রোগ দেখা দেয়।
(v) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বিপাকে বিঘ্ন হয়।

৩০। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন "সি" এবং ভিটামিন "ডি" এর উৎস লিখ। ০৭

ভিটামিন 'সি' এর উৎস ঃ

সকল প্রকার টাটকা জাতীয় ফল যেমন- আমড়া, কমলা লেবু, লেবু, টমেটো, জাম, কাঁচা তেঁতুল, আনারস, আঙ্গুর, মরিচ, টাটকা শাকসবজি।

ভিটামিন "ডি" এর উৎস ঃ

দুধ, মাখন, ডিম, ইলিশ মাছের তৈল, কড লিভার, তৈল, নারিকেল শাস, পশুর যকৃত প্রভৃতি খাদ্য এবং সূর্য কিরনের দ্বারা মানুষের দেহে এই ভিটামিন স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়।

৩১। প্রশ্ন ঃ ম্যারাসম্যাস ও কোয়াসিওরকর এর মধ্যেকার পার্থক্যসমূহ লিখ।

ম্যারসমাস ও কোয়াশিয়রকর এর মধ্যে পার্থক্য ঃ

ম্যারসমাস		কোয়ারশিয়রকর
ম্যারাসমাস ক্যালোরি এবং প্রোটিনের অভাব জনিত রোগ।	১	কোয়াশিয়রকর প্রোটিনের অভাবে এবং অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের কারণে হয়।
ইহাতে প্রচন্ড মাংসপেশীর শীর্ণতা হয়।	২	ইহাতে সামান্য মাংসপেশীর শীর্ণতা থাকে।
ইহাতে শোথ থাকে না।	৩	ইহাতে শোথ বর্তমান থাকে।
ইহাতে মুখমন্ডল শীর্ণতাযুক্ত থাকে এবং বৃদ্ধদের মত দেখায়।	৪	ইহাতে মুখমন্ডল ফোলা থাকে।
ডায়রিয়া ও বমিবমি ভাব ও বমি থাকে।	৫	ক্ষুধাহীনতা ও ডায়রিয়া থাকে।
ইহাতে সাবকিউটেনাস ফ্যাটসহ মাংসপেশী শীর্ণ হয়।	৬	ইহাতে সাবকিউটেনাস ফ্যাট ফোলা ও মাংসপেশী শীর্ণ থাকে।
চর্মের পরিবর্তন সামান্য হয়।	৭	ইহাতে চর্মের বর্ণ পরিবর্তন বেশি হয়।
ইহাতে চুলের বর্ণ সামান্য পরিবর্তন হয়।	৮	ইহাতে চুলের বর্ণ গ্রে বা লাল এবং পাতলা হয়।
লিভার Shunken	৯.	লিভার বিবৃদ্ধিসহ ফ্যাটি ইনফিলট্রেশন।
ইহাতে অ্যালবুমিন স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকে।	১০	ইহাতে অ্যালবুমিন খুব কম থাকে (very low)।
Urine urea maintained (ইহাতে সমান থাকে)	১১	very low urine urea (কম থাকে)

৩২। প্রশ্ন ঃ বেরিবেরি এবং কোয়াশিয়রকরের তুলনামূলক আলোচনা কর।

বেরিবেরি এবং কোয়াশিয়রকরের তুলনামূলক আলোচনা ঃ

বেরিবেরি		কোয়াশিয়রকর
বেরি-বেরি এমন একটি রোগ যাহা ভিটামিন বি$_1$ (থায়ামিন) অভাবে উৎপন্ন হয়।	১	কোয়াশিয়রকর প্রোটিনের অভাব এবং অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের কারনে হয়।
ইহাতে সামান্য মাংসপেশীর শীর্ণতা থাকে।	২	ইহাতে সামান্য মাংসপেশীর শীর্ণতা থাকে।
ইহাতে পেশীর শীর্ণতা সর্বাঙ্গে শোথ, পায়ে শোথ ইত্যাদি লক্ষণাবলী সৃষ্টি করে।	৩	ইহাতে শোথ পা, এবডোমেন ও মুখমন্ডলে বেশি থাকে।
ইহাতে হৃৎপিন্ডের দুর্বলতা বেশি থাকে।	৪	ইহাতে হৃৎপিন্ডের দুর্বলতা নাই।
ক্ষুধাহীনতা ও ডাইরিয়া থাকে না।	৫	ক্ষুধাহীনতা ও ডাইরিয়া থাকে।

৩৩। প্রশ্ন ঃ বেরিবেরি এবং ম্যারাসমাসের তুলনামূলক আলোচনা কর।

বেরিবেরি এবং ম্যারাসমাসের তুলনামূলক ঃ

বেরিবেরি		ম্যারাসমাস
বেরি-বেরি এমন একটি রোগ যাহা ভিটামিন বি$_1$ (থায়ামিন) অভাবে উৎপন্ন হয়।	১	ম্যারাসমাস ক্যালোরি এবং প্রোটিনের অভাব জনিত রোগ।
পেশীর শীর্ণতাসহ সর্বাঙ্গে শোথ, হৃৎপিন্ডের দূর্বলতা, পায়ে শোথ ইত্যাদি লক্ষণাবলী সৃষ্টি করে।	২	ইহাতে প্রচন্ড মাংসপেশীর শীর্নতা হয় এবং ইহাতে শোথ থাকে না।
ইহাতে মুখমন্ডল শোথযুক্ত থাকে।	৩	ইহাতে মুখমন্ডল শীর্নতাযুক্ত থাকে এবং বৃদ্ধদের মত দেখায়।

সপ্তম অধ্যায়

প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য

Maternity and child health care

১। প্রশ্ন ঃ সদ্যজাত শিশুর খাদ্য সম্পর্কে বর্ণনা কর। ১০
অথবা, মাতৃ দুগ্ধের গুরুত্ব বর্ণনা কর?
অথবা, শিশু পরিচর্যায় মাতৃদুগ্ধের ভূমিকা কি? ১১, ১৩, ১৭
অথবা, মায়ের দুধের বিকল্প নাই - ব্যাখ্যা কর? ০৯, ১৫
সদ্যজাত শিশুর খাদ্য সম্পর্কে বর্ণনা ঃ

একটি শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। মাতৃদুগ্ধে শিশুর স্বাস্থ্য উপযোগী যে সকল উপাদান রয়েছে, তা অন্য কোন দুধে নাই। অর্থাৎ মায়ের দুধের বিকল্প নেই।

নিম্নে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হল ঃ

(i) শিশু জন্মের ৩দিন পর্যন্ত মাতৃস্তনের দুধে কলেষ্টাম সমৃদ্ধ দুধ থাকে যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(ii) মায়ের দুধে প্রচুর পরিমাণে ইমিউনোগ্লোবিউলিন রয়েছে যা অন্য কোন দুধে পাওয়া সম্ভব নয়।

(iii) সব রকম ভিটামিন ও নানা রোগ প্রতিষেধক বস্তু শিশুর দেহে অবিকৃত অবস্থায় প্রবেশ করে।

(iv) মাতৃদুগ্ধ দ্বারা শিশু সংক্রামিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

(v) মাতৃদুগ্ধ সঠিক তাপ মাত্রায় থাকে যা শিশু সহজে হজম করে ও দেহের পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে।

(vi) মাতৃদুগ্ধের জন্য অর্থ ব্যয় হয় না।

(vii) শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানে মায়ের দেহের সুস্থতা তাড়াতাড়ি ফিরে আসে এবং জরায়ু সংকোচনে সাহায্য করে।

(viii) মাতৃদুগ্ধ পান কালে শিশু ও মায়ের মধ্যে এক আত্মীক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যা শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। শিশু ও মায়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন তৈরী হয়।

২। প্রশ্ন ঃ সদ্যজাত শিশুর পরিচর্যা সম্পর্কে লিখ। ০৮, ০৯, ১৬

সদ্যজাত শিশুর পরিচর্যা ঃ

শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে যে সকল যত্ন করণীয় তা নিচে আলোচনা করা হল ঃ

(i) শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সংগে সংগে জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে চোখ, মুখ, নাক মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

(ii) শিশু প্রথম কেঁদে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নাভী হতে $1\frac{1}{2}$ ইঞ্চি দূরে প পর ১ ইঞ্চি ব্যবধানে দুইটি বাঁধন দিয়ে আম্বিলিক্যাল কর্ড কেটে শিশুকে মা থেকে আলাদা করতে হবে।

(iii) শিশু জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে আম্বিলিক্যাল কর্ড শুকিয়ে যায় এবং সাতদিনের মধ্যে শুকনো কর্ড খসে পড়ে। এক দিন কর্ড খোলা রাখতে হবে এবং গোসলের সময় ভেজানো যাবে না। প্রত্যেক দিন স্পিরিট দিয়ে কর্ড পরিষ্কার করে দিতে হবে।

(iv) জন্মের পর শিশুর শরীরের তাপমাত্রা ৩৬-৩৭°C এ রাখতে হবে।

(v) জন্মের পর শিশু আঠালো সবুজ পায়খানা করে, একে মেকোনিয়াম বলে। তারপর হলুদ পায়খানা হয়। দুধ খাওয়ার পরই পায়খানা হয়।

(vi) জন্মে ১/২ ঘন্টার মধ্যে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।

(vii) শিশুর জন্মের ২ মাস থেকে ২ বছরের মধ্যে টিকা দিতে হবে।

(viii) শিশু ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ২০ ঘন্টা ঘুমায়।

(ix) শিশুর ত্বকের রং শীঘ্রই লালবর্ণ হতে ফ্যাকাশে রং ধারণ করে, ত্বক শুষ্ক দেখায়, বিভিন্ন রকম র‍্যাস দেখা দিতে পারে।

CamScanner

৩। প্রশ্ন ঃ মায়ের দুধ ও গরুর দুধের মধ্যে পার্থক্য লিখ । ১১, ১৬

মায়ের দুধ ও গরুর দুধের মধ্যে পার্থক্য ঃ

উপাদান	মায়ের দুধ	গরুর দুধ
১। আমিষ	২.৫%-৩%	৪%
২। স্নেহ	২.৭৫%-৩.২৫%	৩.৫%-৩.৭৫%
৩। শর্করা	৫%এর বেশী	৪.৫%-৪.৭৫%
৪ ।লবণ উপাদান সমূহ	০.২%প্রায়	০.৭৫%প্রায়
৫। জলীয় অংশ	৮৮%	৮৭%

৪। প্রশ্ন ঃ গর্ভবতী মায়ের যত্নের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিখ। '১১

গর্ভবতী মায়ের যত্নের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ঃ

প্রসূতি স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ প্রসব পূর্ব পরিচর্যা, প্রসবকালীন পরিচর্যা ও প্রসবোত্তর পরিচর্যা।

প্রসব পূর্ব পরিচর্যা ঃ

(i) **পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঃ** সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। দাঁত, মুখ, হাত, পা, যোনীদেশ প্রভৃতি নিয়মিত ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

(ii) **খাবার ঃ** সহজে হজম হয় এরূপ পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে। ফল, দুধ, মাছ, ডিম, প্রভৃতি খাদ্য প্রতিদিন নিয়মিত পরিমাণে আহার করতে হবে।

(iii) **কাজকর্ম ঃ** নিয়মিত স্বাভাবিক কাজ কর্ম করা উচিত। অতিরিক্ত পরিশ্রম করা নিষেধ। কোন ভারী জিনিষ উঠানো বা নামানো উচিৎ নয়।

(iv) **কোষ্ঠবদ্ধতা ঃ** কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য নিয়মিত ফলমূল, শাকসবজি খাওয়া উচিৎ।

(v) ব্যায়াম ঃ নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করতে হবে। প্রত্যেহ সকাল সন্ধ্যায় মুক্ত ও শীতল বায়ুতে হাটতে হবে। লাফানো এবং সিঁড়ি দিয়ে বেশী উঠা নামা করা যাবে না।

(vi) মানসিক শান্তি ঃ মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে, সদা প্রফুল্ল থাকার চেষ্টা করতে হবে।

(vii) সর্বোপরি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলো বাতাস আছে এরূপ ঘরে বাস করা উচিৎ।

প্রসবকালীন পরিচর্যা ঃ

(i) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানায় প্রসব করাতে হবে।

(ii) প্রসবের পূর্বে যৌনীদ্বার এন্টিসেপটিক দ্বারা ওয়াশ করতে হবে।

গর্ভবতী মায়ের প্রসবোত্তর যত্ন সম্পর্কে ঃ

(i) **জননতন্ত্র ও মূত্রাশয় যত্ন ঃ** সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির জননতন্ত্র ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। বিশেষত সন্তান প্রসবের ১২ ঘন্টার মধ্যে প্রসূতিকে প্রস্রাব করাতে হবে। প্রসূতিকে ৬-৮ ঘন্টার পর পর প্রস্রাব করতে বলতে হবে।

(ii) **দেহের তাপমাত্রা ঃ** নিয়মিত দেহের তাপমাত্রা মাপতে হবে।

(iii) **দুগ্ধদান ঃ** শিশুকে নিয়মিত বুকের দুধ দিতে হবে।

(iv) **পথ্যাপথ্য ঃ** প্রসূতির পথ্য এমন হতে হবে যাতে সহজে হজম হয়। পুষ্টিকর ও তাজা ফলমূল দিতে হবে।

(v) **নিদ্রা ঃ** প্রসবোত্তরকালে প্রসূতির সুনিদ্রা ব্যবস্থা করতে হবে।

(vi) **ব্যায়াম ঃ** পেলভিস অঞ্চলের ও পেটের পেশীসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করাতে হবে।

৫। প্রশ্ন ঃ গর্ভবতী মায়ের প্রসব-পূর্ব যত্ন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে লিখ।
বা, গর্ভবতী মায়ের প্রসব পূর্ববর্তী যত্ন সম্পর্কে যাহা জান লিখ।১৫

প্রসব পূর্ব পরিচর্যা ঃ

(i) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঃ সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। দাঁত, মুখ, হাত, পা, যোনীদেশ প্রভৃতি নিয়মিত ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

(ii) খাবার ঃ সহজে হজম হয় এরূপ পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে। ফল, দুধ, মাছ, ডিম, প্রভৃতি খাদ্য প্রতিদিন নিয়মিত পরিমাণে আহার করতে হবে।

(iii) কাজকর্ম ঃ নিয়মিত স্বাভাবিক কাজ কর্ম করা উচিত। অতিরিক্ত পরিশ্রম করা নিষেধ এবং কোন ভারী জিনিষ উঠানো বা নামানো উচিৎ নয়।

(iv) কোষ্ঠবদ্ধতা ঃ কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্য নিয়মিত ফলমূল, শাকসবজি খাওয়া উচিৎ।

(v) ব্যায়াম ঃ নিয়ম মাফিক হালকা ব্যায়াম করতে হবে। প্রত্যেহ সকাল সন্ধ্যায় মুক্ত ও শীতল বায়ুতে হাটিতে হবে। লাফানো এবং সিঁড়ি দিয়ে বেশী উঠা নামা করা যাবে না।

(vi) মানসিক শান্তি ঃ মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করতে হবে, সদা প্রফুল্ল থাকার চেষ্টা করতে হবে।

(vii) সর্বোপরি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলো বাতাস আছে এরূপ ঘরে বাস করা উচিৎ।

গর্ভাবস্থায় ডাক্তারী পরীক্ষা ঃ

(i) প্রত্যেক মাসে গর্ভবতীর রক্তের চাপ, ওজন, প্রস্রাব ও গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান প্রভৃতি পরীক্ষা করতে হবে।

(ii) রক্ত পরীক্ষা Blood sugar, Blood Group A, B, AB, O and RH System পরীক্ষা করাতে হবে।

(iii) রক্তস্বল্পতা থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

(iv) গর্ভবর্তী মহিলাকে ১২-১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিমাসে একবার, ২৮-৩৫ সপ্তাহ পর্যন্ত ১৫ দিনে একবার চিসিৎসককে দেখিয়ে পরামর্শ নেবার জন্য উপদেশ দিতে হবে।

(v) দৈনিক ৮-১০ ঘন্টা ঘুমাতে হবে।

(vi) গর্ভের পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে ১ মাস ব্যাবধানে ২টি টি.টি ইনজেকশন দিতে হবে।

(vii) গর্ভাবস্থায় যত কম ঔষধ খাওয়া যায় ততই ভাল।

৬। প্রশ্ন ঃ গর্ভবতী মায়ের প্রসবোত্তর যত্ন সম্পর্কে লিখ। ০৮

গর্ভবতী মায়ের প্রসবোত্তর যত্ন সম্পর্কে ঃ

(i) **জননতন্ত্র ও মূত্রাশয় যত্ন ঃ** সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির জননতন্ত্র ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। বিশেষত সন্তান প্রসবের ১২ ঘন্টার মধ্যে প্রসূতিকে প্রস্রাব করাতে হবে। প্রসূতিকে ৬-৮ ঘন্টার পর পর প্রস্রাব করতে বলতে হবে।

(ii) **দেহের তাপমাত্রা ঃ** নিয়মিত দেহের তাপমাত্রা মাপতে হবে।

(iii) **দুগ্ধদান ঃ** শিশুকে নিয়মিত বুকের দুধ দিতে হবে।

(iv) **পথ্যাপথ্য ঃ** প্রসূতির পথ্য এমন হতে হবে যাতে সহজে হজম হয়। পুষ্টিকর ও তাজা ফলমূল দিতে হবে।

(v) **নিদ্রা ঃ** প্রসবোত্তরকালে প্রসূতির সুনিদ্রা ব্যবস্থা করতে হবে।

(vi) ব্যায়াম ঃ পেলভিস অঞ্চলের ও পেটের পেশীসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করাতে হবে।

৭। প্রশ্ন ঃ উচ্চ মাতৃ মৃত্যুহারের কারণসমূহ লিখ। ১৩, ১৫

উচ্চ মাতৃ মৃত্যুহারের কারণসমূহ ঃ

(i) অল্প বয়সে সন্তান ধারণ

(ii) অধিক সন্তান জন্মদান।

(iii) পুষ্টিহীনতা।

(iv) দারিদ্রতা।

(v) অশিক্ষা-কুশিক্ষা।

(vi) প্রি-একলামসিয়া ও একলামসিয়া।

(vii) প্রসবকালীন অস্বাভাবিকতা ও জটিলতা।

(viii) বিভিন্ন রোগজীবাণুর সংক্রমণের কারণে।

(ix) গর্ভাবস্থায় রক্ত স্বল্পতার কারণে।

(x) গর্ভকালীন রক্ত বিষাক্ততা।

৮। প্রশ্ন ঃ মাতৃসদনের গুরুত্ব লিখ।

মাতৃসদনের গুরুত্ব ঃ

মাতৃসদনের উদ্দেশ্য হল গর্ভাবস্থা হতে প্রসবোত্তরকাল পর্যন্ত মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও যত্ন নেয়া। ইহা প্রজনন প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুর মৃত্যুর সংখ্য কমাতে চেষ্টা করা এবং প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দিয়ে থাকে। ইহা গর্ভাবস্থা, প্রসব ও প্রসবোত্তরকালীন স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহন করে বিপদাবলী দূরীকরণে চেষ্টা করে। সুতরাং মাতৃসদনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৯। প্রশ্ন ঃ কোন ধরনের রোগ ই. পি. আই. বা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী দ্বারা প্রতিরোধ করা যায় ?

ই. পি. আই. বা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী দ্বারা নিম্নলিখিত রোগসমূহ প্রতিরোধ করা যায় ঃ যক্ষা, ডিপথেরিয়া, পোলিও, হাম, টিটেনাস (ধনুষ্টংকার), হুপিং কাশি এ ছয়টি রোগ প্রতিরোধ করা হয়।

১০। প্রশ্ন ঃ ই. পি. আই বা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী বলতে কি বুঝ?

ই. পি. আই বা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী ঃ

বাংলাদেশের প্রত্যেক শিশুকে ছয়টি সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদানের যে কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে, তাকে ই. পি আই (Expanded programme of immunization) বা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী বলে। যেমন- বি.সি.জি, ডিপিটি, পোলিও, হাম, টিটি ও হুপিং কাশি।

১১। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশের জাতীয় টিকাদান কর্মসূচীর সিডিউল লিখ।

বাংলাদেশের জাতীয় টিকাদান কর্মসূচীর সিডিউল (Expended programme on immunisation) ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শে কিছু মারাত্মক ক্ষতিকারক সংক্রামক রোগের হাত হতে শিশুদের বাঁচানোর জন্য শিশুকাল হতে টিকা দেয়া নিয়ম করা হয়েছে। যথা ঃ- ১। ডিপথেরিয়া, ২। হুপিং কাশি, ৩। ধনুষ্টংকার, ৪। পোলিওমায়েলাইটিস, ৫। যক্ষা, ৬। হাম। এই ৬ টি টিকা শিশুর নির্দিষ্ট বয়স হতে দেয়া বাধ্যতামূলক। এতে শিশুকালে সংক্রামক রোগ হতে রক্ষা পায়।

১২। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে EPI কার্যক্রম সম্পর্কে লিখ ? ১১, ১৪
বা, বাংলাদেশে ই.পি. আই এর কার্যক্রম সম্পর্কে যাহা জান লিখ? ১৭

বাংলাদেশে EPI কার্যক্রম (Expanded programme of immunization) বা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে প্রত্যেক শিশুকে ৬টি সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদানের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে, তাকে সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচি বা EPI বলে। বাংলাদেশে EPI কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৯ সালের ৭ই এপ্রিল EPI এর আওতাধীন ৬টি টিকা হল ঃ- ১। ডিপথেরিয়া, ২। হুপিংকাশি, ৩। ধনুষ্টংকার, ৪। পোলিও, ৫। যক্ষ্মা ও ৬। হাম রোগ এর B.C.G, D.P.T. পোলিও, হাম এবং টি, টি টিকা।

শিশুদের এই টিকাগুলি দেওয়া হলে শিশু সারা জীবনের জন্য এই ৬টি রোগ হতে মুক্তি লাভ করে। এই সকল টিকা সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

টিকাদান ছাড়া EPI অনেক রকমের উপদেশ দিয়ে থাকে। যেমন ঃ

(i) পরিবার ছোট রাখা ভাল।

(ii) মায়ের দুধের বিকল্প নাই।

(iii) পাতলা পায়খানা হলে শিশুকে লবণ জল খাওয়াতে হবে।

(iv) ভিটামিন এ এর অভাবে শিশুর অন্ধত্ব রোগ হয়।

(v) প্রচুর শাকসজি, ফল-মূল খেলে ভিটামিন 'এ' এর অভাব দূর হয় ইত্যাদি।

টি, টি টিকার নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হচ্ছে সকল সন্তান ধারনক্ষম মহিলা (১৫-৪৫ বছর বয়সের) তবে গর্ভবর্তী মহিলারা যেন কিছুতেই বাদ না পড়ে। তাছাড়া ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে পোলিও, ভিটামিন-এ ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোও EPI কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

পরিশেষে বলা যায় যে, EPI কার্যক্রম মূলত জনগণের অর্থাৎ বিশেষ করে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

১৩। প্রশ্ন ঃ শিশু স্বাস্থ্যে ই. পি. আই এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

শিশু স্বাস্থ্যে ই. পি. আই এর গুরুত্ব ঃ

শিশু স্বাস্থ্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপদেশ ই. পি. আই. কর্মসূচীতে প্রদান করা হয়। যেমন- পাতলা পায়খানা হলে শিশুকে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ানো, মাতৃদুগ্ধের কোন বিকল্প নাই, ভিটামিন 'এ' এর অভাবে শিশুর অন্ধত্ব রোগ হয় এবং প্রতিদিন সবুজ শাকসবজি খাওয়ালে ভিটামিন 'এ' এর অভাব দূর হয়। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী ছয়টি মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক প্রদান করে যেমন- বি.সি.জি, ডিপিটি, পোলিও, হাম, টিটি ও হুপিং কাশি। এই প্রতিষেধকের মাধ্যমে শিশুকাল হতে যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, পোলিও, হাম, টিটেনাস (ধনুষ্টংকার), হুপিং কাশি এ ছয়টি রোগ প্রতিরোধ করা হয়। এই মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকাগুলো শিশুকালের একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু করে, নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর পর দিতে হয়। এই কর্মসূচীর আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের সকল শিশুকে সেবার সুযোগ দেয়ার জন্য সকল টিকা সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যের উপর ই.পি.আই এর গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ।

১৪। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারনসমূহ কি কি?

বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারনসমূহ ঃ

(i) বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ।

(ii) ঠান্ডাজনিত রোগ- কাশি, ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।

(iii) ডায়রিয়া ও কলেরা।

(iv) পুষ্টিহীনতা।

(v) অল্প বয়সে মাতা সন্তান ধারণ করা।

অষ্টম অধ্যায়

সংক্রামক রোগ (Infectious diseases)

১। প্রশ্ন ঃ সংক্রামক ব্যাধি বলতে কি বুঝ ? ইহার প্রধান উৎসগুলি লিখ। ০৮, ১১

সংক্রামক ব্যাধি (Infectious diseases) ঃ

যে সকল রোগ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস, হেলমিনথ্যাসসহ বিভিন্ন মাইক্রো অর্গানিজম দ্বারা সংঘঠিত হয় এবং এক দেহ থেকে অন্য দেহে পানি, বায়ু, খাদ্য ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র বাহক মাধ্যমে প্রবাহিত ও বিস্তার লাভ করে, তাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে।

সংক্রামক ব্যাধির উৎসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(i) ফাংগাস, (ii) ব্যাকটেরিয়া, (iii) ভাইরাস,
(iv) হেলমিনথ্যাস। (v) ক্ষুদ্র জীবাণু মশা, ইদুর, বিড়াল ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন ঃ ড্রপলেট সংক্রমণ বলতে কি বুঝ? সংক্রামক ব্যাধি ও সাধারণ ব্যাধির মধ্যে পার্থক্য কর। ১৪

ড্রপলেট সংক্রমণ (Droplet Infection) ঃ

রোগী হাঁচি-কাশি, জোরে কথা বলা, জোরে নিঃশ্বাস ফেলার সময়, তার মুখ ও নাকের মধ্য হতে সূক্ষ্ম পানির কণা বা শ্লেষ্মা জলীয় বাষ্পের সাথে মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, যেমন- হুপিংকাশি, হাম, যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতির জীবাণুগুলো বাহির হতে থাকে। এই শ্লেষ্মা কণা ও বায়ু বাহিত সংক্রামক রোগের জীবাণুসমূহ ৬ ফুট দূরত্বের মধ্যে এক দেহ হতে অন্য দেহে সরাসরি সংক্রমিত হলে, তাকে ড্রপলেট সংক্রামক (Droplet Infection) বলে। যেমন- যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি ইত্যাদি।

সংক্রামক ব্যাধি ও সাধারণ ব্যাধির মধ্যে পার্থক্য ঃ

সংক্রামক ব্যাধি		সাধারণ ব্যাধি
যে সকল রোগ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস, হেলমিন্থাসসহ বিভিন্ন মাইক্রো-অর্গানিজম দ্বারা সংঘঠিত হয় এবং এক দেহ থেকে অন্য দেহে পানি, বায়ু, খাদ্য ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র বাহকের মাধ্যমে প্রবাহিত ও বিস্তার লাভ করে, তাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে।	১	যে সকল ব্যাধি এক দেহ হতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয় না, তাকে সাধারণ ব্যাধি বলে। যেমন ঃ মাথা ব্যাথা, রিকেট ইত্যাদি।
ইহা এক দেহ হতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়।	২	ইহা এক দেহ হতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয় না।
ইহা ড্রপলেট সংক্রমণ হতে পারে।	৩	ইহা ড্রপলেট সংক্রমণ না হতে পারে।
ইহা সাধারণতঃ জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয়।	৪	ইহা জীবাণু ছাড়াও সংঘটিত হতে পারে। যেমন- অস্থিভংগ।
উদাহরণ- হাম, যক্ষ্মা, পানি বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি।	৫	উদাহরণ-গ্যাস্টিক, পিত্তপাথরী মূত্রপাথরী ইত্যাদি।

৩। প্রশ্ন ঃ রোগের উপ্তিকাল ও সংক্রমণকাল বলিতে কি বুঝ ? ০৯, ১
বা, রোগের উপ্তিকাল/সুপ্তিকাল কাকে বলে ? রোগ সংক্রমণ কাল কা বলে ? ১৫, ১৬

রোগের উপ্তিকাল/ সুপ্তিকাল (Incubation period) ঃ

দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দেহে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার মধ্যবর্তী সময় রোগের উপ্তিকাল বা সুপ্তিকাল বলা হয়।

রোগ সংক্রমণ কাল ঃ

রোগ জীবাণু রোগীর দেহে প্রবেশ করার পর যে সময় পর্যন্ত ঐ দেহে অবস্থান করে অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে, সে সময়কে রোগ সংক্রমণ কাল বলে।

৪। প্রশ্ন ঃ সংক্রামক ব্যাধি কাকে বলে ? তিনটি সংক্রামক ব্যাধির নাম লিখ। ১২

সংক্রামক ব্যাধি ঃ

যে সকল রোগ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস, হেলমিন্থাসসহ বিভিন্ন মাইক্রো-অর্গানিজম দ্বারা সংঘঠিত হয় এবং এক দেহ থেকে অন্য দেহে পানি, বায়ু, খাদ্য ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র বাহকের মাধ্যমে প্রবাহিত ও বিস্তার লাভ করে, তাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে।

তিনটি সংক্রামক ব্যাধির নাম ঃ

(i) কলেরা, (ii) হাম, (iii) টিউবারকুলোসিস (যক্ষা)

৫। প্রশ্ন ঃ সংক্রামক ব্যাধি ও সাধারণ ব্যাধি বলতে কি বুঝ ? ০৯, ১৬

সাধারণ ব্যাধি ঃ

যে সকল ব্যাধি এক দেহ হতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয় না, তাকে সাধারণ ব্যাধি বলে। যেমন ঃ মাথা ব্যাথা, রিকেট ইত্যাদি।

সংক্রামক ব্যাধি ঃ

যে সকল রোগ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ফাংগাস, হেলমিন্থাসসহ বিভিন্ন মাইক্রো-অর্গানিজম দ্বারা সংঘঠিত হয় এবং এক দেহ থেকে অন্য দেহে পানি, বায়ু, খাদ্য ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র বাহকের মাধ্যমে প্রবাহিত ও বিস্তার লাভ করে, তাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে। ইহাকে ছোঁয়াছে রোগও বলে।

৬। প্রশ্ন ঃ মাছি কিভাবে রোগ ছড়ায় ? ১০, ১২

মাছি নিম্নলিখিতভাবে রোগ ছড়ায় ঃ

মাছি এক প্রকার রোগ জীবাণু বাহক পতঙ্গ। অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গাগাদির মধ্যে মাছিই সর্বাপেক্ষা অধিক রোগ বিস্তার করে। যেমন- কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি রোগ মাছি দ্বারা সংক্রামিত হয়। যত নোংরা পরিত্যাক্ত আবর্জনা, রোগী ও সুস্থ লোকের মলমূত্র, বমি, থুথু, কফ ও রক্ত মাছির উপাদেয় খাবার। আবার ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী ও এরা খায়। মাছির পাখা এক জোড়া ও পা তিন জোড়া এবং একটি শুর রয়েছে। অপরিষ্কার ও দূষিত স্থানে যাতায়াতের ফলে সে স্থানের জীবাণু পায়ে ও ডানায় অতি সহজেই লেগে যায়। পরে ঐ স্থান হতে মাছি আসে অরক্ষিত খোলা খাদ্যদ্রব্যের উপর বসে বহনকৃত জীবাণু ছড়িয়ে দেয় এবং জীবাণুর সংক্রমণ ঘটায়। মূলতঃ মাছির জন্মই হল অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা স্থানে। যার দরুন এই প্রাণীর দ্বারা অনিষ্ট সাধন হয়ে থাকে। এই দূষিত খাদ্য আহার করে সুস্থ ব্যক্তি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। আর এভাবেই মাছি আমাদের ক্ষতি করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মাছি আমাদের কাছে পরম শত্রু এবং ভয়াবহ রোগ জীবাণুর বাহক পতঙ্গ।

৭। প্রশ্ন ঃ রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে লিখ। ০৮

রোগ সংক্রমণের বিভিন্ন পথ সম্পর্কে ঃ

(i) পানিবাহিত, (ii) বায়ুবাহিত, (iii) খাদ্যবাহিত, (iv) সরাসরি সংস্পর্শে, (v) পরোক্ষভাবে রোগ সংক্রমণ, (vi) জীবাণুবাহক দ্বারা রোগ সংক্রমণ, (vii) কীটপতঙ্গ দ্বারা রোগ সংক্রমণ। (vii) মাটি মাধ্যমে।

৮। প্রশ্ন ঃ জীবাণু মুক্তকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর। ০৮, ১১, ১২
অথবা, সাধারণ নির্বীজন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
জীবাণু মুক্তকরণ পদ্ধতি বর্ণনা ঃ

যে কোন উপায়ে কিংবা রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নানা রকম রোগের জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাকে জীবাণুমুক্তকরণ বলে এবং যে পদ্ধতিতে এই কাজ সাধিত হয়, তাকে নির্বীজন বা জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি বলা হয়।

নির্বীজন বা জীবাণুমুক্তকরণ অর্থ কোন সংক্রামক রোগের বিশিষ্ট জীবাণু ধ্বংস এবং তার বিস্তার নিবারণ করা।
ইহা প্রধাণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -
(i) স্বাভাবিক (Natural) ও (ii) কৃত্রিম (Artificial) উপায়ে।
(i) স্বাভাবিক (Natural) জীবাণুকরণ ঃ ইহা তিন প্রকার। যথা ঃ-
(ক) নির্মল বায়ু (খ) সূর্যালোক (গ) বায়ু প্রবাহ।
(ক) নির্মল বায়ু ঃ নির্মল বায়ুর মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু অতি অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়।
(খ) সূর্যালোক ঃ সূর্যালোকের উত্তাপ ও সূর্যকিরণের অতি বেগুনি রশ্মির জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা অত্যধিক এবং নির্বীজন করার ক্ষমতা ও অনেক বেশী, যেমন- কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের জীবাণু নষ্ট হয়।
(গ) প্রবাহ ঃ বায়ু প্রবাহ দ্বারা জীবাণু এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়, ফলে অনেক সময় নষ্ট হয়।
(ii) কৃত্রিম (Artificial) জীবাণুমুক্তকরণ ঃ

কৃত্রিম উপায়ে অনেক দ্রব্য নির্বীজন হয়। ইহা সাধারণতঃ ২ প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। যথা ঃ
(ক) প্রকৃত প্রক্রিয়া (Physical means)
(খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়া (Chemical means)

(ক) প্রকৃত প্রক্রিয়া (Physical means)

ইহা সাধারণত দুই ভাবে হয়ে থাকে। যথা ঃ

(১) শুষ্ক উত্তাপ দ্বারা, যেমন- আগুন প্রয়োগ।

(২) আর্দ্র উত্তাপ দ্বারা, যেমন- স্ফুটন দ্বারা।

(খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঃ

একে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

(১) বাষ্পীয় রাসায়নিক নির্বীজন। যেমন ঃ- গন্ধক, ক্লোরিন।

(২) তরল রাসায়নিক নির্বীজন। যেমন ঃ- কার্বলিক এসিড, লাইসল, মাইলিন, ফর্মালিন ইত্যাদি।

(৩) কঠিন রাসায়নিক নির্বীজন। যেমনঃ- পটাশিয়াম, ক্লোরিন, আয়োডিন ইত্যাদি।

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণ করা সম্ভব।

৯। প্রশ্ন ঃ পানিবাহিত পাঁচটি রোগের নাম লিখ। ১২

পানিবাহিত পাঁচটি রোগের নাম ঃ

(i) ডায়রিয়া, (ii) ডিসেন্ট্রি, (iii) টাইফয়েড ও প্যারা টাইফয়েড, (iv) হেপাটাইটিস, (v) কলেরা।

১০। প্রশ্ন ঃ বায়ু বাহিত পাঁচটি রোগের নাম লিখ। ১০, ১৩, ১৭

বায়ুবাহিত রোগ ঃ

যে সকল রোগের জীবাণু বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের সুস্থ দেহে প্রবেশ করে এবং নানা রোগ সৃষ্টি করে। সে সকল রোগকে বায়ুবাহিত রোগ বলে।

বায়ু বাহিত পাঁচটি রোগের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

(i) সর্দি। (ii) হুপিং কাশি। (iii) যক্ষ্মা। (iv) হাম। (v) নিউমোনিয়া।

ম্যালেরিয়া
(Malaria)

১। প্রশ্ন ঃ ম্যালেরিয়া কি ? এর কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা কর। ১৪, ১৭

ম্যালেরিয়ার সংজ্ঞা ও কারণ ঃ

ম্যালেরিয়া কীট পতঙ্গ বাহিত সংক্রামক রোগ। Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale নামক প্রোটোজোয়া দ্বারা ইহা সংক্রামিত হয়। Mall (মল) খারাপ বা দূষিত Area (এরিয়া) স্থান অর্থাৎ Malaria খারাপ বা দূষিত স্থানেই হয়। এনোফিলিস নামক স্ত্রী মশা এ রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর দেহে যখন এনোফিলিস স্ত্রী মশা রক্ত শোষণ করে রক্তের মধ্যস্থিত জীবাণু মশার পাকস্থলীতে চলে যায়। পুনঃরায় যখন কোন সুস্থ মানুষকে দংশন করে তখন তার লালাগ্রন্থি হতে জীবাণু সুস্থ দেহে প্রবেশ করে। তখন দংশিত ব্যক্তির মধ্যে ৮-১০ দিনের মধ্যে রোগ লক্ষণ দেখা দেয়।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণাবলী ঃ

ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ:৩টি অবস্থায় বিদ্যমান ঃ

(ক) ম্যালেরিয়া জ্বরের শীতাবস্থা ঃ

(i) শীত লাগে, কম্প দিয়ে জ্বর আসে ও হাত পা ঠান্ডা।

(ii) শীতে দাঁত ঠক ঠক করে কাপে কাঁথা বা লেপের মধ্যে ঢুকতে চায়।

(iii) প্রবল পিপাসা লাগে বমি ও ঘন ঘন প্রস্রাবের বেগ হয়।

খ) উত্তাপাবস্থা ঃ

(i) প্রচন্ড জ্বর উঠে ১০৬°-১০৭° F পর্যন্ত ওঠে।

(ii) প্রবল মাথা ব্যথা ও মাথা ভারী হয়ে আসে।

(iii) রোগী গায়ের কাঁথা ফেলে দেয়।

(গ) ঘর্মাবস্থা ঃ

(i) প্রচন্ড ঘাম হয় এবং বিছানাপত্র ভিজে উঠে।

(ii) মাথার যন্ত্রণা ও জ্বর ছেড়ে যায়।

(iii) পিপাশা থাকে না ও ক্ষুধা লাগে, রোগী সুস্থ বোধ করে ও ঘুমায়।

(iv) এরকম অবস্থা ২৪, ৮৪, ৭২ ঘন্টা পর পর চলতে থাকে।

(v) এই জ্বর পুরাতন বা বেশী দিন অতিবাহিত হলে প্লীহা ও যকৃত বিবৃদ্ধি পায়।

(vi) এনিমিয়া ঃ শরীরের এনিমিয়া দেখা দেয়। দিন দিন দুর্বল হতে থাকে, খাবারের রুচি থাকে না, তৃপ্তিদায়ক ঘুম হয় না, পায়খানায় অনিয়ম দেখা দেয় কখনও কোষ্ঠবদ্ধতা আবার মল নরম।

(vii) স্প্লিনমেগালী দেখা দিবে।

(viii) হেপাটোমেগালী- বেশির ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে দেখা দেয়।

২। প্রশ্ন ঃ ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাসমূহ কি কি ?

ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থাসমূহ ঃ

(i) এনোফিলিস মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

(ii) বাড়ীর আশেপাশে ডোবা নালা পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে মশা বংশ বৃদ্ধি করতে না পারে।

(iii) সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে হবে।

(iv) ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে আলাদা ঘরে মশারীর মধ্যে রাখতে হবে এবং দ্রুত আরোগ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রয়োজনে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

৩। প্রশ্ন ঃ ম্যালেরিয়া রোগ কিভাবে ছড়ায় ?

ম্যালেরিয়া রোগ নিম্নলিখিতভাবে ছড়ায় ঃ বাহক ট্রান্সমিশন ঃ স্ত্রী এনোফিলিস মশা। সরাসরি- ব্লাড ট্রান্সফিউশন, ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, কনজেনিটাল- সামান্য।

টাইফয়েড
(Typhoid)

১। প্রশ্ন ঃ টাইফয়েড এর সংজ্ঞা দাও।

টাইফয়েড এর সংজ্ঞা ঃ

টাইফয়েড হচ্ছে একিউট সংক্রামক রোগ যা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাস স্যালমোনিলা টাইফি দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং কিছু নির্দেশক লক্ষণসমূহ দ্বারা প্রকাশিত হয়। যেমন- মাথাব্যথা, সব সময় উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত জ্বর, অস্থিরতা, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ব্রাডিকার্ডিয়া, এবডোমেনের অস্বস্থি, পর্যায়ক্রমে ডায়রিয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা, স্প্লীন বৃদ্ধি পায় এবং রোগী অত্যন্ত টক্সিক হয়।

সুপ্তিকাল - ১০-১৪ দিন।

সংক্রমণ পথ - পানি, দুধ, খাদ্য এবং মাছি এর মাধ্যমে ছড়ায়।

২। প্রশ্ন ঃ টাইফয়েড রোগের লক্ষণাবলী লিখ।

বা, টাইফয়েড রোগের লক্ষণাবলী লিখ।

টাইফয়েড রোগের লক্ষণাবলী ঃ

প্রথম সপ্তাহ ঃ

(i) জ্বর- রেমিটেন্ট ফিভার, ৪-৫ দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(ii) মাথাব্যথা, অস্বস্থিকর বোধ।

(iii) পালস রেট কমে যাবে।

(iv) কোষ্ঠবদ্ধতা।

প্রথম সপ্তাহ শেষে ঃ

(i) শরীরে (ট্রাঙ্ক) গোলাপী স্পট দেখা যাবে।

(ii) স্প্লীনোমেগালী ও হেপাটোমেগালী দেখা দিবে।

(iii) কাশি দেখা দিবে।

(iv) এবডোমিনাল ডিস্টেনশন, উদরাময়।

(v) ডান ইলিয়াক ফোসাতে অনুভূতি প্রবণ।

দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষে ঃ

(i) ডেলিরিয়াম

(ii) কম্প্রেশন।

(iii) কোমা হতে পারে।

৩। প্রশ্ন ঃ টাইফয়েড জ্বরের জটিল ও বিপদ জনক উপসর্গসমূহ কি কি?

টাইফয়েড জ্বর জটিল আকার ধারন করলে নানা প্রকার বিপদজ্জনক উপসর্গসমূহ ঃ

(i) শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ ও দ্বার হতে রক্তস্রাব। যেমন- ফুসফুস, নাসিকা, দাঁতের মাড়ি, মলদ্বার, অন্ত্র ইত্যাদি এবং আন্ত্রিক ছিদ্র হতে পারে।

(ii) প্রবল উদরাময়ের ফলে শক হতে পারে।

(iii) হঠাৎ জ্বরের বৃদ্ধি ও গুরুতর অবস্থার ফলে নিউমোনিয়া ও প্লুরিসি হতে পারে।

(iv) শিশুদের ক্ষেত্রে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হতে পারে।

(v) গর্ভাবস্থায় টাইফয়েড হলে এর জটিলতা কারণে ভ্রুণের মৃত্যু হতে পারে।

(vi) খিচুনী দেখা দিতে পারে।

(vii) এবডোমেনে তীব্র ব্যথা ও স্ফীতি, বমিবমিভাব ও বমি, জ্বরের বৃদ্ধি, রোগীর চেহারা পরিবর্তন ও মৃত্যু হতে পারে।

উপরিউক্ত লক্ষণগুলো টাইফয়েড জ্বরের ক্ষেত্রে জটিল ও বিপদজ্জনক বিধায় এ সকল উপসর্গ প্রকাশ পেলে অবশ্যই রোগীকে অতি সতর্কতার সহিত চিকিৎসা করতে হবে।

৪। প্রশ্ন ঃ টাইফয়েড জ্বরের তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য লিখ। ১০

টাইফয়েড জ্বরের তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য ও রোগানুসন্ধান ঃ

টাইফয়েড জ্বরের তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য ঃ

(i) শীত শীতভাব, জ্বর বৃদ্ধি পায়, প্রত্যেক দিন জ্বর ৯৯° থেকে ১০১° ডিগ্রী পর্যন্ত উঠানামা করে।

(ii) সপ্তাহ শেষের দিকে হঠাৎ বুকে-পিঠে ব্যথাসহ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর ১০১° থেকে ১০৩° ডিগ্রী পর্যন্ত দেখা দেয়।

(iii) মাঝে মাঝে জ্বর আসার সময় ঘাম দেখা যায় এবং ঘাম হয়ে জ্বরের তাপমাত্রা কমে কিন্তু জ্বর ছাড়ে না।

(iv) জ্বরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় সুচিকিৎসা না হলে জ্বর ১০১° থেকে ১০৪° ফাঃ থাকে।

৫। প্রশ্ন ঃ টাইফয়েড জ্বরের ইনভেস্টিগেশন (রোগানুসন্ধান) লিখ। ১০

টাইফয়েড জ্বরের রোগানুসন্ধান ঃ

প্রথম সপ্তাহ-

(i) ব্লাড কাউন্ট- লিউকোপেনিয়া সাথে লিম্ফোসাইটোসিস।

(ii) ব্লাড কালচার- সালমোনিলা টাইফি-পজেটিভ।

প্রথম সপ্তাহ শেষে-

(i) উইডাল টেস্ট- পজেটিভ হবে।

২য় সপ্তাহে-

(i) ইউরিন কালচার- পজেটিভ হতে পারে।

২য় থেকে ৩য় সপ্তাহে-

(i) মলের কালচার- পজেটিভ হতে পারে।

৬। প্রশ্ন ঃ টাইফয়েড জ্বরের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা লিখ।

টাইফয়েড জ্বরের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ

বিজ্ঞপ্তিকরণঃ টাইফয়েড ফিভার সম্বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

আইসোলেশন ঃ আক্রান্ত ব্যক্তিকে আলাদাভাবে রাখতে হবে।

টাইফয়েড জ্বরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

(i) ইমিউনাইজেশন (প্রতিরোধক ব্যবস্থা)- প্রতিষেধক।

(ii) নিরাপদ পানি পান করতে হবে।

(iii) স্যানিটারী টয়লেট ব্যবহার করতে হবে।

(iv) নিরাপদ খাদ্য- ধুলা ও মাছি হতে খাদ্যকে নিরাপদে রাখতে হবে এবং খোলা খাবার পরিহার করতে হবে। খাদ্য বস্তুকে হাইজিনিকভাবে প্রস্তুত ও পরিবেশন করতে হবে।

(v) দুধকে পাস্তুরাইজেশন বা বয়েল করতে হবে।

(vi) স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। প্রশ্ন ঃ টিউবারকলোসিস এর স্থানগুলো কি কি?

টিউবারকলোসিস এর স্থানসমূহ ঃ

দেহের বিভিন্ন স্থানে টিউবারকুলোসিস হতে পারে। তবে টিউবারকুলোসিস এর সচরাচর স্থান-

(i) ফুসফুস, (ii) ইন্টেস্টাইন বা অন্ত্র, (iii) ইউরিনারী ট্রাক্ট, (iv) বোন বা অস্থি, (v) লিম্ফনোট, (vi) স্কিন, (vii) ব্রেইন ও মেনিনজেস।

যক্ষ্মারোগ (Tuberculosis)

১। যক্ষ্মা রোগ কি ? ইহার কারণসমূহ লিখ।

যক্ষ্মা রোগ ঃ যক্ষ্মা হচ্ছে একটি সংক্রামক রোগ যা মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস দ্বারা সৃষ্টি হয়।

যক্ষ্মা রোগের কারণসমূহ ঃ

ক) মূলকারণঃ সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস।

খ) আনুসঙ্গিক কারণ ঃ (i) মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস,

(ii) বংশগত কারণে,

(iii) পরিবেশগত কারণে,

(iv) আক্রান্ত ব্যক্তির কফ, থুথু যেখানে সেখানে ফেলার কারণে,

(v) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব,

(vi) ধুম পান, সাদাপাতা, জর্দা ইত্যাদি সেবন।

২। প্রশ্ন ঃ পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের ক্লিনিক্যাল্ ফিচার লিখ।

বা, টিউবারকুলোসিসের লক্ষণাবলী লিখ।

ক্লিনিক্যাল ফিচার ঃ

symptoms: (ক) পালমোনারী বা ফুসফুস সম্পর্কিত ঃ

(i) তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি থাকলে হতে পারে।

(ii) প্রোডাক্টিভ কফ কিংবা ননপ্রোডাক্টিভ কফ

(iii) হেমোপটাইসিস (iv) বুকে ব্যথা

(v) অস্কালটেশনে ক্রিপিটেশন পাওয়া যেতে পারে।

(খ) সিস্টেমিক বা সার্বদৈহিক ঃ

(i) এনোরেক্সিয়া (ক্ষুধামন্দা), (ii) অবসাদ বা ক্লান্তি,

(iii) মাথাব্যথা, (iv) জেনারেল ডিবিলিটি, (v) শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, (vi) বুকে ব্যথা, (vii) বিকালে/সন্ধ্যায়/রাতে উচ্চতাপযুক্ত জ্বর, (viii)

যক্ষ্মারোগ (Tuberculosis)

১। যক্ষ্মা রোগ কি ? ইহার কারণসমূহ লিখ।

যক্ষ্মা রোগ ঃ যক্ষ্মা হচ্ছে একটি সংক্রামক রোগ যা মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস দ্বারা সৃষ্টি হয়।

যক্ষ্মা রোগের কারণসমূহ ঃ

ক) মূলকারণঃ সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস।

খ) আনুসঙ্গিক কারণ ঃ (i) মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকুলোসিস,

(ii) বংশগত কারণে,

(iii) পরিবেশগত কারণে,

(iv) আক্রান্ত ব্যক্তির কফ, থুথু যেখানে সেখানে ফেলার কারণে,

(v) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব,

(vi) ধুম পান, সাদাপাতা, জর্দ্দা ইত্যাদি সেবন।

২। প্রশ্ন ঃ পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের ক্লিনিক্যাল্ ফিচার লিখ।

বা, টিউবারকুলোসিসের লক্ষণাবলী লিখ।

ক্লিনিক্যাল ফিচার ঃ

symptoms: (ক) পালমোনারী বা ফুসফুস সম্পর্কিত ঃ

(i) তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কাশি থাকলে হতে পারে।

(ii) প্রোডাক্টিভ কফ কিংবা ননপ্রোডাক্টিভ কফ

(iii) হেমোপটাইসিস (iv) বুকে ব্যথা

(v) অস্কালটেশনে ক্রিপিটেশন পাওয়া যেতে পারে।

(খ) সিস্টেমিক বা সার্বদৈহিক ঃ

(i) এনোরেক্সিয়া (ক্ষুধামন্দা), (ii) অবসাদ বা ক্লান্তি,

(iii) মাথাব্যথা, (iv) জেনারেল ডিবিলিটি, (v) শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, (vi) বুকে ব্যথা, (vii) বিকালে/সন্ধ্যায়/রাতে উচ্চতাপযুক্ত জ্বর, (viii)

শ্বাসকষ্ট, (ix) প্লুরায় ব্যথা, (x) সিভিয়ার এ্যানিমিয়া, (xi) রাতে ঘর্মস্রাব, (xii) কাশি/কফের সঙ্গে রক্তক্ষরণ।

(গ) জটিলতার লক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। যেমন- (i) প্লুরাল ইফিউশন (ii) নিউমোথোরাক্স ইত্যাদি।

২। প্রশ্ন ঃ যক্ষ্মারোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর। ১৪

যক্ষ্মারোগের লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা ঃ

যক্ষ্মারোগের লক্ষণ বর্ণনা ঃ

(i) খুসখুসে কাশি এবং অল্প তাপমাত্রাযুক্ত জ্বর থাকবে।

(ii) অল্প পরিশ্রমে অত্যধিক দুর্বলতা হতে পারে।

(iii) ক্ষুধামান্দ্য ও হজম শক্তি কমে যায়।

(iv) শরীরের ওজন হ্রাস।

(v) কফের সাথে রক্ত যেতে পারে।

(vi) পালস দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

যক্ষ্মারোগের প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা ঃ

(i) রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। তা সম্ভব না হলে রোগী আলাদা ঘরে রাখতে হবে।

(i) দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) রোগীকে আলো-বাতাসপূর্ণ ও পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন ঘরে র হবে।

(iv) রোগীর কফ, থুথু, বমি ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থানে পুতে ফেলতে হ

(v) আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে।

(vi) রোগীর ব্যবহারিত কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন ইত্যাদি স্থানে পরিষ্কার করতে হবে এবং উহা অন্য কেউ ব্যবহার করবে

(vii) বাড়ীর অন্যদের পরীক্ষা করে প্রয়োজনে প্রতিষেধক দিতে

ডায়রিয়া বা উদরাময়
(Diarrhoea)

১। প্রশ্ন ঃ উদরাময় বা ডায়রিয়ার সংজ্ঞা লিখ।

উদরাময়ের সংজ্ঞা ঃ

দিনে তিন বা তার অধিক বার পাতলা ও পানিময় পুনঃপুনঃ তরল মল নিঃসরনকে উদরাময় বলে। (Passage of looge or watery stools 3 or more times per day , here consistency is important than frequency.)

শ্রেণীবিভাগ ঃ উদরাময় দুই প্রকার। যথা - একিউট ডায়রিয়া ও ক্রনিক ডায়রিয়া।

২। প্রশ্ন ঃ উদরাময় বা ডায়রিয়ার কারণ উল্লেখ কর।

ডায়রিয়ার কারণ ঃ

ক) মূল কারণ ঃ সোরার সাময়িক উচ্ছ্বাস।

খ) আনুসঙ্গিক/উত্তেজক কারণ ঃ

(i) ভাইরাস ঃ রোটাভাইরাস ৮০%। এডভেনোভাইরাস, এন্টেরো ভাইরাস।

(ii) ব্যাকটেরিয়া ঃ যেমন- ভিব্রিও কলেরা, শিগেলা, ক্লস্ট্রিডিয়াম এন্টারোটক্সিজেনিক, ইসকেরিসিয়া কোলি, সালমোনিলা, এন্টামিবা হিষ্টোলাইটিকাসহ বিভিন্ন প্রকার পায়োজেনিক মাইক্রোঅর্গানিজম।

(iii) বাসি-পঁচা খাদ্য গ্রহণ,

(iv) দূষিত পানি পান,

(v) অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ,

(vi) খাদ্যের বিষাক্ততা।

(vii) হেলমিন্থাস যেমন- ট্রাইচুরিয়াসিস, এসক্যারিয়াসিস, জিয়ারডিয়া ইন্টেসটিনালিস ইত্যাদি।

(viii) অন্যান্য আন্ত্রিক প্রভাবক, যেমন- ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স, ইনফ্লামেটরী বাওয়েল ডিজিজ, এমাইলডোসিস

(ix) ম্যাল এবজরপশন, যেমন- সিলিয়াক স্প্রু, ডায়ভার্টিকুলাইসিস ইত্যাদি

(x) অন্যান্য ম্যাগনেশিয়ামযুক্ত ঔষধ, এন্টিবায়োটিক, সাইকোজেনিক।

৩। প্রশ্ন ঃ উদরাময়ের ক্লিনিক্যাল ফিচার বা লক্ষণাবলী লিখ।

ক্লিনিক্যাল ফিচার/লক্ষণাবলী ঃ

(i) জ্বর- জ্বরভাব ও জ্বর থাকতে পারে।

(ii) এবডোমিনাল পেইন।

(iii) বমিবমিভাব ও বমি।

(iv) ঘন ঘন পাতলা মল ত্যাগ।

(v) ডিহাইড্রেশন।

(vi) প্রচন্ড দুর্বলতা।

(vii) পানির পিপাসা অধিক বা কম হতে পারে।

(viii) শক বা অজ্ঞান হতে পারে।

(ix) কনভালশন বা খিঁচুনী হতে পারে।

(vi) রাইস স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

(vii) লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাতে হবে।

৭। প্রশ্ন ঃ ডায়রিয়ার কারণ ও প্রতিরোধের পাঁচটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ১৩

ডায়রিয়ার কারণ ঃ ক) মূল কারণ ঃ সোরার সামর্য়িক উচ্ছ্বাস।

খ) আনুসঙ্গিক কারণ ঃ

(i) বাসি-পঁচা খাদ্য গ্রহন, (ii) দূষিত পানি পান,

(iii) অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহন, (iv) খাদ্যের বিষাক্ততা।

(v) বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোঅর্গানিজম।

ডায়রিয়ার প্রতিরোধের পাঁচটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

১। পডোফাইলাম ঃ

পডোফাইলামের মল রাত্রি ৩টা হতে সকাল ১০টা পর্যন্ত বৃদ্ধি হয় ও প্রচুর পরিমানে গড়গড় শব্দ করে মল নিঃসৃত হয়। মলত্যাগের পর পেট খালি হয়ে যায়, কিন্তু পুনরায় মলত্যাগের আগে গড়গড় শব্দ করে।

২। আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম ঃ

ডায়রিয়া পানাহারের পর বাড়ে। পানি পান করা মাত্র ডায়রিয়ার মল, সেসঙ্গে বায়ুশূল এবং ঢেঁকুর উঠা ইহার নির্ণায়ক লক্ষণ।

৩। ক্যালকেরিয়া-ফস্ফোরিকাম ঃ

দূর্গন্ধ, উদর বায়ুপূর্ণ, পড়পড় শব্দকারী ডায়রিয়া। মায়ের স্তন্যদুগ্ধ নীলাভ ও নোনতা, শিশু তা পান করতে চাহে না। কিছু খাওয়া মাত্র পেটে ব্যথা। ঘুমের ভিতর থেকে থেকে কেঁদে উঠে। শিশুরা রাগী ও খিটখিটে। হলুদ বা সবুজবর্ণের মল, মল গরম। শিশু মাতৃদুগ্ধ পানের পর ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া বমি করে সামান্য ঠান্ডাতেই বৃদ্ধি। পঁচা বা ভাজা মাছ-মাংস খাতে ভালবাসে।

৪। সিনা ঃ

মল সবুজ, হড়হড়ে, পিত্তমিশ্রিত, সাদা, মিউকাসযুক্ত, গুঁড়ি গুঁড়ি চালের মত পদার্থ মলের মধ্যে দেখা যায়। লাল বর্ণের শ্লেষ্মা। রক্তময় মল। পানির মত মল, ঘন ঘন বেগ। অসাড়ে মলত্যাগ হয়। কিছুদিন কোষ্ঠবদ্ধতা ও কিছুদিন উদরাময় চলতে থাকে। দাঁত উঠার সময় উদরাময়। কিছু পান বা খাবার পর উদরাময়, দিনে বৃদ্ধি। মলের সঙ্গে ক্রিমি দেখা যায়। রোগী বড় খিটখিটে ও রাগী, কিছু দিলে তৎক্ষণাৎ ফেলে দেয়। বমি, জিহ্বা পরিষ্কার। প্রস্রাব কোন স্থানে শুকালে মনে হয় যেন সেখানে চুন পড়ে আছে।

৫। চায়না-অফিসিন্যালিস ঃ

উদরাময় সাধারণতঃ রাত্রেই বেশী হয়, তবে অন্যান্য সময়ও হতে পারে, কিছু খাবার পর এর উদরাময়ের মল ঘন হলুদবর্ণের বা ফিকা হলুদবর্ণের পানির মত, দুর্গন্ধযুক্ত ও অজীর্ণ খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত। খাদ্যদ্রব্যের অজীর্ণ অংশ গোটা গোটা মলের সাথে নির্গত হয় ও সেসঙ্গে অত্যধিক পেটফাঁপা থাকে। পিপাসা, কিন্তু সামান্য পানি পান করে থাকে। মলত্যাগের পর রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। বায়ু জমে পেট ফোলে: পেটের ভিতর নানাপ্রকার কষ্ট হয় অথচ উদ্গারে বা বায়ুনিঃসরণে মোটেই উপশম হয় না।

৮। প্রশ্ন ঃ ডায়রিয়াল ডিজিজ কাকে বলে? কয়েকটি ডায়রিয়াল ডিজিজের নাম ও জীবাণুর নাম লিখ।

ডায়রিয়াল ডিজিজ এর সংজ্ঞা ঃ

ডায়রিয়াল ডিজিজ বলতে এক গুচ্ছ রোগকে বোঝায় যাদের অন্যতম প্রধান প্রকাশ ডায়রিয়ার মাধ্যমে হয়।

ডায়রিয়াল ডিজিজ এর নাম ও জীবাণুর নাম ঃ

রোগের নাম	রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম

ডায়রিয়াল ডিজিজ গ্যাস্ট্রো এন্টেরাইটিস	(১) ই. কলাই (২) রোটাভাইরাস (৩) সালমোনেলা (৪) জিয়ারাডিয়া (৫) ক্যাম্পাইলো ব্যাকটার জেজুনি (৬) এন্টেরো ভাইরাস (৭) ভাইরাস
কলেরা ব্যাসিলারী ডিসেন্টারী এমিবিক ডিসেন্টারী	ভিব্রিও কলেরি শিগেলা এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা

৯। প্রশ্ন ঃ একিউট ডায়রিয়ার চিকিৎসা বর্ণনা কর।

একিউট ডায়রিয়ার চিকিৎসা ঃ

(ক) উপশম প্রদায়ক চিকিৎসা সাধারণ ব্যবস্থাপনা ঃ

(i) বিছানায় বিশ্রামে রাখতে হবে।

(ii) ডিহাইড্রেশন দূরীকরণ ঃ ওআরএস দ্বারা, গ্লুকোজ স্যালাইন দ্বারা, রাইস স্যালাইন দ্বারা ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড যেমন- কলেরা স্যালাইন, নরমাল স্যালাইন।

(iii) মারাত্মক ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রলাইট ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

(iv) খাদ্য ঃ সাধারণত প্রথম অবস্থায় তরল খাবার এরপর বার বার অর্ধতরল খাবার।

(খ) ঔষধজ চিকিৎসা ঃ লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতে হবে।

কলেরা (Cholera)

১। প্রশ্ন ঃ কলেরার জীবাণুর নাম এবং সুপ্তিকাল লিখ। ১২

কলেরার জীবাণুর নাম ঃ ভিব্রিও কলেরা Vibrio cholerae

সুপ্তিকাল ঃ কয়েক ঘন্টা হতে ৫ দিন।

২। প্রশ্ন ঃ কলেরার লক্ষণাবলি বর্ণনা কর। ১২

কলেরার লক্ষণাবলি বর্ণনা ঃ

কলেরার তিনটি ফেইজে প্রতিচ্ছবি দেখা য়ায়।

(i) ইভাকুয়েশন ফেইজ (Evacuation phase) ঃ হঠাৎ করে ব্যথা বা কলিক ব্যথা ছাড়া পানির মত পাতলা মল বা উদরাময় দেখা দেয়। এর সাথে বমিবমিভাব ও বমি হতে পারে।

(ii) কোলাপ্স ফেইজ (Collapse phase) ঃ সার্কুলেটরী শক- চর্ম শীতল ঘর্মাক্ত, টেকিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন এবং পেরিফেরাল সায়ানোসিস। ডিহাইড্রেশন- চোখ কোটরাগত, চেহারা মলিন, প্রস্রাব ত্যাগ কমে যায়, এছাড়াও প্রচন্ড মাংসপেশী সংকোচন দেখা দেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে খিচুনী দেখা দিতে পারে।

(iii) রিকভারী ফেইজ (Recovery phase) ঃ যদি রোগী কোলাপ্স স্টেজে থেকে বেঁচে যায়, তবে রোগী ধীরে ধীরে ক্লিনিক্যালভাবে আরোগ্যের দিকে যায়।

৩। প্রশ্ন ঃ কলেরার জটিলতা লিখ। ১২, ১৬

কলেরার জটিলতা ঃ

(i) ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতার কারণে- হাইপোক্যালসেমিয়া, টিটানী, হাইপোগ্লাসেমিয়া, এসিডোসিস ইত্যাদি রোগ হতে পারে।

(ii) জ্বরযুক্ত আক্ষেপ (সংকোচন)।

(iii) পালমোনারী ইডিমা।

(iv) উচ্চ মৃত্যুসংখ্যা ঃ শিশু ১৫% এবং এডাল্ট ৫% (প্রায়)।

৪। প্রশ্ন ঃ ব্যাসিলারী ও এ্যামিবিক ডিসেন্ট্রির মধ্যে পার্থক্য লিখ।

➩ ব্যাসিলারী ও এ্যামিবিক ডিসেন্ট্রির মধ্যে পার্থক্য ঃ

পয়েন্ট	ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি	এ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি
১। অর্গানিজম	শীগেলা গ্রুপ অর্গানিজম।	এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা।
২। আরম্ভ	ইহা হঠাৎ আরম্ভ হয়।	ইহা ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়।
৩। মলের পরিমাণ	ইহাতে মলের পরিমান কম, রক্ত ও মিউকাস বেশি।	ইহাতে মল, রক্ত ও মিউকাস মিশ্রিত হয়।
৪। বর্ণ	উজ্জ্বল লাল বর্ণের।	কালো বর্ণের।
৫। গন্ধ	তেমন ইহাতে দূর্গন্ধ নেই।	ইহাতে খুব বেশি দূর্গন্ধ।
৬। জ্বর ও শীতবোধ	ইহাতে জ্বর ও শীত বোধ বর্তমান।	ইহাতে সাধারণতঃ জ্বর থাকে না।
৭। মল ত্যাগ	ইহাতে দিনে ১০-২০ বার মলত্যাগ করে।	ইহাতে ২-৫ বার মলত্যাগ করে।
৮। ডায়রিয়া ও ডিহাইড্রেশন	ইহাতে ডায়রিয়া ও ডিহাইড্রেশন প্রচন্ড ভাবে দেখা দেয়।	ইহাতে ডায়রিয়া ও ডিহাইড্রেশন দেখা দেয় না।
৯। সময়	গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বেশি হয়, অন্যান্য সময় হতে পারে।	ইহার নির্দিষ্ট কোন সময় নাই যে কোন সময় হতে পারে।
১০। রোগের গতি	ইহা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন করে।	ইহা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, ফলে রোগীর অবস্থা কম জটিল হয়।
১১। ব্যথা	ইহাতে বাম সাইডে ব্যথা ও কলিক ধরনে হয়।	ইহাতে ডান সাইডে ব্যথা করে।

৫। প্রশ্ন ঃ কলেরা রোগের আক্রমণ ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর। ০৯, ১২, ১৬

বা, কলেরা ও আমাশয়ের প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর। ১৪

কলেরা রোগের আক্রমণ ঃ

কলেরা পানি ও খাদ্য বাহিত সংক্রামক রোগ। ভিব্রিও কলেরী নামক এক প্রকার জীবাণু দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিতভাবে কলেরা রোগের বিস্তার বা সংক্রমণ বা আক্রমণ ঘটে থাকে।

(i) **খাদ্য ও পানীয় দ্বারা ঃ** রোগীর মল ও বমির সাথে কলেরার জীবাণু নির্গত হয়। আর এই জীবাণু কোনভাবে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হলে রোগ সংক্রমিত হয়।

(ii) **মাছি দ্বারা ঃ** মাছি কলেরা জীবাণুর প্রধান বাহক। কলেরা রোগীর মল ও বমির উপর বসা মাছি, যদি পরবর্তীতে খাবারের উপর বসে তা হলে কলেরা জীবাণু খাদ্যের সংক্রমিত হয়। ফলে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

(iii) **জলাশয়ের পানি ব্যবহারের দ্বারা ঃ** যে কোন জলাশয় (নদী, পুকুর, কুয়া) বা তার নিকট কলেরা রোগীর মল, বমি, কাপড়-চোপড় ধৌত করলে ঐ সমস্ত জলাশয়ের পানি দূষিত হয় এবং ঐ দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে রোগ সংক্রমিত হয়।

(iv) **খোলা খাবার ও পানীয় দ্বারা ঃ** খোলা খাবার, ফলের রস, কাটা ফল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য কলেরা জীবাণু দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। (পানি বা মাছি দ্বারা) এবং রোগের বিবৃতি ঘটতে পারে।

(v) **খোলা পায়খানা হতে ঃ** খোলা পায়খানা বা যত্রতত্র মলত্যাগে কলেরা জীবাণু বিস্তার লাভ করে থাকে।

কলেরা প্রতিরোধের উপায় ঃ

কলেরা দেখা দিলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(i) কলেরা দেখা দিলে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য খবর দিতে হবে।

(ii) রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে, তা না হলে রোগীকে আলাদা রুমে রেখে চিকিৎসা করতে হবে।

(iii) রোগীর বমি ও মল একটি পাত্রে সংগ্রহ করতে হবে। পাত্রে ব্লিচিং পাউডার বা ফিনাইল দিতে হবে, যাতে জীবাণু বিস্তার লাভ করতে না পারে।

(iv) রোগীর কাপড়, বিছানা-পত্র, থালা-বাসন কোন জলাশয়ের ধারে ধৌত করা যাবে না। অপ্রয়োজনীয় জিনিষ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, তা না হলে ফুটন্ত পানিতে ধুয়ে কড়া রোদে শুকাতে হবে।

(v) যে সকল খাবারে সমস্যা দেখা দিতে পারে, সে খাবার বর্জন করতে হবে। পাতলা পায়খানা হওয়ার সাথে সাথে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

(vi) পরিবারের সকলকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

(vii) বিশুদ্ধ পানি অর্থাৎ টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে। তা না হলে পানি ২০ মিনিট ফুটিয়ে বা পানি বিশুদ্ধ করে পান করতে হবে।

(viii) খাদ্য দ্রব্য সব সময় ঢেকে রাখতে হবে, যেন মাছি বসতে না পারে। খাদ্যদ্রব্য সব সময় গরম অবস্থায় খেতে হবে।

(ix) কলেরা প্রতিষেধক টিকা নিতে হবে।

(x) নর্দমা জঙ্গল প্রভৃতি পরিষ্কার করে মশার উৎপত্তিস্থল বিনষ্ট করতে হবে।

(xi) পঁচা বাসি ও অধিক পাকা ফল খাওয়া বর্জন করতে হবে।

উপরিউক্ত নিয়মসমূহ পালন করার মাধ্যমে কলেরা নামক ভয়াবহ সংক্রামক রোগ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে।

পানি বসন্ত (Chicken pox)

১। প্রশ্ন ঃ পানি বসন্ত এর সংজ্ঞা দাও।

পানি বসন্তের সংজ্ঞা (Chicken pox) ঃ

পানি বসন্ত এক প্রকার তরুণ উচ্চ সংক্রামক রোগ যা Varicella zoster virus নামক জীবাণু দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং শরীরের মধ্যে র‍্যাস প্রকাশ, জ্বরসহ বিভিন্ন লক্ষণ সৃষ্টি করে, তাকে পানি বসন্ত (চিকেন পক্স) বলে।

২। প্রশ্ন ঃ পানি বসন্তের কারণসমূহ লিখ।

পানি বসন্তের কারণতত্ত্ব ঃ

(A) মূলকারণ ঃ– (১) সোরা

(B) আনুসঙ্গিক কারণ/উত্তেজক কারণ ঃ

(i) জীবাণু – Varicella zoster virus

(ii) Age–১০ বছরের কম বয়সীরা বেশি আক্রান্ত হয় এবং বৃদ্ধদের হতে পারে।

(iii) Sex – উভয়ই সমানভাবে আক্রান্ত হয়।

(iv) Season – সকল ঋতুতে হতে পারে তবে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রকোপ বেশি।

(v) ঘনবসতিপূর্ন এলাকায় দ্রুত ছড়ায়।

৩। প্রশ্ন ঃ পানি বসন্তের জীবাণুর নাম ও সুপ্তিকাল লিখ।

পানি বসন্তের জীবাণুর নাম – Varicella zoster virus

Incubation period is 14 – 21 days.

৪। প্রশ্ন ঃ পানি বসন্ত এর ক্লিনিক্যাল ফিচার (লক্ষণাবলী) লিখ। ১০

পানি বসন্ত এর ক্লিনিক্যাল ফিচার ঃ

(i) হঠাৎ জ্বর, কোমরে ব্যথা।

(ii) অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ, দুর্বলতা ও ক্ষুধাহীনতা।

(iii) কাশি, মাথা ব্যথা ও শরীর ব্যথা এবং গলা ব্যথা করে।

(iv) র‍্যাস প্রথমে বুকে ও পিঠে বাহির হয়।

(v) র‍্যাস দ্রুত মাথা, মুখমন্ডল ও হস্তপদাতিতে বাহির হয়।

(vi) র‍্যাস বিভিন্ন স্তরে দেখা যায় – Macules appear first, and within a few hours lesions become popular and then vesicular and, within 24 hours pastular.

র‍্যাস কিছু মধ্যে শুকিয়ে যায় এবং মামড়ী উঠে, চুলকানি থাকে।

৫। প্রশ্ন ঃ পানি বসন্তের জটিলতা লিখ ?

পানি বসন্তের জটিলতা ঃ

(i) সরাসরি ভাইরাস দ্বারা আক্রমণ- নিউমোনিয়া, মায়োকার্ডাইটিস।

(ii) পোস্ট-ভাইরাল আক্রমন- এনসেফালাইটিস, গ্লোমারুলোনেফ্রাইটিস।

(iii) সেকেন্ডারী ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন- স্কিন ইনফেকশন সেফটিসেমিয়া, অস্টিওমায়োলাইটিস, সেফটিক আর্থ্রাইটিস

(iv) ইন্টাইউটেরাইন ইনফেকশন- কনজেনিটাল লিম্ব ডিফেক্ট (মাঝে মধ্যে)।

৬। প্রশ্ন ঃ পানি বসন্ত ও গুটি বসন্তের মধ্যে পার্থক্য কি ? ০৯, ১১, ১৬

পানি বসন্ত ও গুটি বসন্তেরমধ্যে পার্থক্য ঃ

পানি বসন্ত (Chiekenpox)		গুটি বসন্ত (Smallpox)
পানি বসন্তের সুপ্তি কাল প্রায় ১৫ দিন।	১	গুটি বসন্তের সুপ্তিকাল প্রায় ১২ দিন।
এর সংক্রামন কাল ৩ সপ্তাহ।	২	এর সংক্রামন কাল প্রায় ৬ সপ্তাহ।
লক্ষণ ঃ (ক) গুটিকাগুলি সামান্য জ্বরের সাথে বের হয়।	৩	লক্ষণ ঃ (ক) তিন দিন প্রবল জ্বরের সাথে গুটিকাগুলি বের হয়।
গুটিকাগুলো ৩/৪ দিন পর্যন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয়।	(খ)	গুটিকাগুলো এক সঙ্গে বের হয়।
গুটিগুলোতে নরম ও তরল পদার্থ পূর্ণ থাকে।	(গ)	গুটিকাগুলি শক্ত দানার মত।
বুকে পিঠে ও মুখে দেখা দেয়।	(ঘ)	গুটিকাগুলি মুখমন্ডলে ও বাহুতে বেশী হয়।
মধ্যস্থলে গর্ত হয় না ও দাগ থাকে না।	(ঙ)	গুটিকা শুকালে মধ্যস্থলে গর্ত হয় ও দাগ থাকে।
যেহেতু ক্রমান্নয়ে বাহির হয়, সেজন্য একই সময় গুটিকার বিভিন্ন স্তর দেখা যায়।	(চ)	একই সময়ে গুটির বিভিন্ন স্তর দেখা যায় না।
হারপিজ জোষ্টার ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়।	৪	ভেরিওলা নামক ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি।
সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যে এপিডেমিক আকারে ছড়ায় গুটি বসন্তের মত মারাত্মক না হলেও কষ্টদায়ক।	৫	মারাত্মক সংক্রামক রোগ, পৃথিবীতে ধ্বংসলীলাকারীদের অন্যতম।

৭। প্রশ্ন ঃ পানি বসন্তের চিকিৎসা লিখ ?

পানি বসন্তের চিকিৎসা ঃ

(i) রোগীকে আলাদা রুমে রেখে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।
(ii) রোগীর রুমে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
(iii) রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্য-বস্তু দিতে হবে।
(iv) রোগের উত্তেজক খাদ্যবস্তু পরিহার করতে হবে।
(v) রোগীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
(vi) রোগীর রোগ লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করতে হবে।

গুটি বসন্ত (Small pox)

৮। প্রশ্ন ঃ গুটি বসন্তের লক্ষণাবলী লিখ।

গুটি বসন্তের লক্ষণাবলী ঃ

(i) গুটিকাগুলো ৩/৪ দিন পর্যন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয়।
(ii) গুটিকাগুলি সামান্য জ্বরের সাথে বের হয়।
(iii) গুটিগুলোতে নরম ও তরল পদার্থ পূর্ণ থাকে।
(iv) হারপিজ জোষ্টার ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়।
(v) সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যে এপিডেমিক আকারে ছড়ায়, গুটি বসন্তের মত মারাত্মক না হলে ও কষ্টদায়ক।
(vi) গুটিকাগুলো এক সঙ্গে বের হয়। ভেরিওলা নামক ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি।
(vii) গুটিকাগুলি মুখমন্ডলে ও বাহুতে বেশী হয়।
(viii) একই সময়ে গুটির বিভিন্ন স্তর দেখা যায় না।
(ix) গুটিকা শুকালে মধ্যস্থলে গর্ত হয় ও দাগ থাকে।
(x) Incubation period – 1 – 3 দিন।

Mumps – কর্ণমূল প্রদাহ

১। প্রশ্ন ঃ মাম্পস এর সংজ্ঞা দাও।

মাম্পস এর সংজ্ঞা ঃ

মাম্পস এক প্রকার তরুণ সংক্রামক রোগ যা Paramyxovirus দ্বারা স্কুলগামী শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে আক্রান্ত হয় এবং জ্বর, অত্যানুভূতি, ব্যথা ও স্যালাইভারী গ্ল্যান্ড, বিশেষতঃ প্যারোটিড, সাবম্যানডিকুলার বা সাবলিংগুইনাল গ্ল্যান্ড ফুলে যায়।

২। প্রশ্ন ঃ মাম্পসের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম এবং সুপ্তিকাল লিখ। ১৬

মাম্পসের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম ঃ Paramyxovirus

মাম্পসের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর সুপ্তিকাল ঃ প্রায় ১৮ দিন (২-৩ সপ্তাহ) Incubation period :– 2 – 3 weeks (Average -18 days)

৩। প্রশ্ন ঃ মাম্পস এর প্রকারভেদ লিখ।

মাম্পস এর প্রকারভেদ ঃ

মাম্পস দুই প্রকার। যথা– (i) তরুণ কর্ণমূল প্রদাহ,

(ii) পুরাতন কর্ণমূল প্রদাহ

৪। প্রশ্ন ঃ মাম্পস এর কারণতত্ত্ব লিখ।

মাম্পস এর কারণতত্ত্ব ঃ

(A) মূলকারণ/প্রধানকারণ– (i) সোরা, (i) বংশগত সিফিলিস

(B) আনুসাঙ্গিক/উত্তেজক কারণ ঃ

(i) Agent – Paramyxovirus

(ii) Age – ৫ – ১৫ বছরের ছেলেমেয়েদের বেশি হয়।

(iii) Sex –পুরুষ ও মহিলা উভয়ে সমানভাবে আক্রান্ত হয়।

(iv) Season– বছরের সকল ঋতুতে এই রোগ হয় তবে শীতকালে এর আক্রমণের হার বেশি।

(v) Environment – ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় দ্রুত রোগের বিস্তার লাভ করে।

(vi) অতিরিক্ত ঠান্ডা এবং ঠান্ডা জাতীয় খাদ্য ও পানীয়।

(vii) অন্যান্য রোগের জটিলতার কারণে – স্কার্লেট জ্বর, হাম, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি।

৫। প্রশ্ন ঃ মাম্পস এর ক্লিনিক্যাল ফিচার লিখ।

বা, লক্ষণাবলী বর্ণনা কর।

বা, মাম্পস কি ? ইহার লক্ষণাবলী লিখ।

বা, ইহার ছয়টি লক্ষণ বর্ণনা কর।

মাম্পস এর ক্লিনিক্যাল ফিচার/ লক্ষণাবলী ঃ

(i) জ্বর – ১০২° – ১০৩° F অবসন্নতা বর্তমান থাকবে।

(ii) মুখের 'R' এ্যাংগেল বরাবর প্রদাহিত হবে এবং ফুলে যাবে বিশেষত, কানের পাশের একটি বা উভয় প্যারোটিড গ্ল্যান্ড।

(iii) সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হতে পারে।

(iv) কর্ণমূল গ্রন্থিতে স্পর্শকাতরতা ও উত্তপ্ত, লালবর্ণ ধারণ করে।

(v) হাঁ করতে, কোন কিছু গিলিতে, ঢোঁক গিলিতে কষ্ট হয়।

(vi) মুখ থেকে লালাস্রাব হতে পারে।

(vii) দুর্বলতা ও মাথা ব্যথা বর্তমান থাকবে।

৬। প্রশ্ন ঃ মাম্পাস এর ইভেস্টিগেশন লিখ।

মাম্পস এর ইভেস্টিগেশন ঃ

Investigation : (1) Blood for TC↑, DC↓, ESR↑, Hb%↓
(2) Culture – Virus can be isolated in cell culture from salviva, Throat swabs, urine, CSR or blood.

৭। প্রশ্ন ঃ মাম্পাস এর ভাবীফল ও জটিলতা লিখ।
বা, মাম্পস্-এর ছয়টি জটিলতা এবং ভাবীফল লিখ।
বা, ইহার জটিলতা ও ভাবীফল লিখ।

মাম্পস এর ভাবীফল ঃ

ভাবীফল খারাপ নয়। উপযুক্ত সময়ে সঠিক কারণ নির্ণয় করে সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা করলে সহজেই রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু বিসদৃশ মতে চিকিৎসা করলে রোগী জটিলতার দিকে ধাবিত হয়।

মাম্পস এর জটিলতা ঃ

(i) অর্চাইটিস, (ii) প্যানক্রিয়েটাইটিস, (iii) ওভারীতে প্রদাহ
(iv) মেনিনজাইটিস, (v) মেনিনগো এনকেফালোইটিস
(vi) মায়োকার্ডাইটিস, (vii) নেফ্রাইটিস।

৮। প্রশ্ন ঃ মাম্পস-এর ব্যবস্থাপনা লিখ। ১১
বা, মাম্পস এর চিকিৎসা আলোচনা কর। ০৮, ১৬

মাম্পস এর চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা ঃ

১। ব্যারাইটা কার্ব ঃ চোয়ালের নীচের অংশের ও টনসিলের স্ফীতি। খুব সহজেই ঠান্ডা লাগে। প্রতিবার ঠান্ডা লাগার পর টনসিলের পুঁজোৎপত্তি। গলক্ষতসহ সূঁচ ফোঁটার মত, হুলফোঁটার মত তীব্র ব্যথা। টনসিল প্রদাহিত, তৎসহ শিরাস্ফীতি। ঢোক গেলার সময় হুলফোটার মত ব্যথা, খালি ঢোক গেলার সময় বৃদ্ধি। কেবলমাত্র তরল বস্তু গিলতে পারে। খাদ্যবস্তু অন্ননালীর ভিতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অন্ননালীর আক্ষেপ, এই কারণে শ্বাস বন্ধ হবার মত

অবস্থা দেখা দেয়। টনসিলে, গলবিলের ভিতর হুলফোটার মত ব্যথা। মুখে পানি উঠে, জিহ্বা এবং ঢেকুর এগুলির সাহায্যে পেটের ভিতর পাথরের মত কিছু থাকার অনুভূতির থেকে আরাম হয়।

২। **বেলেডোনা** ঃ মধ্যকর্ণের প্রদাহ, ব্যথা হতে প্রলাপের সৃষ্টি হয়। শিশু নিদ্রাকালে কান্না করে। মুখগহবর শুষ্ক, মাড়ীতে স্ফোটক, জিহ্বার কিনারা লাল ও স্ফীত। গলদেশ শুষ্ক, যেন ঝকঝক করতেছে, সঙ্কুচিত বলে মনে হয়, গলাধঃকরণ কষ্টসাধ্য। তলপেটে আড়াআড়িভাবে কর্তনবৎ ব্যথা, ঠান্ডা পানি পান করার ইচ্ছা।

৩। **মার্কুরিয়াস সল** ঃ গলদেশ নীলচে লালবর্ণের স্ফীতি। অবিরাম ঢোক গেলার ইচ্ছা। গলায় পচাক্ষত, ডানদিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত। ক্ষতসমূহ ও প্রদাহ, প্রতিবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে দেখা দেয়। ঢোক গেলার সময় কানের ভিতরে সূঁচ ফোটার ন্যায় ব্যথা অনুভূত হয় এবং ঢোক গেলার সময় নাক দিয়ে তরল পদার্থসমূহ ফিরে আসে। গলকোষের প্রদাহ, তৎসহ ঢোক গিলতে কষ্ট হয়, পুঁজ জমা হবার পরে। গলার ভিতরে টাটানি ব্যথা, ছনছন করে, হুল ফোটানোর মত ব্যথা, জ্বালাকর অনুভূতি।

৪। **পালসেটিলা** ঃ মুখমন্ডলের ডানদিকের অংশে স্নায়ুশূল, তৎসহ প্রচুর অশ্রুস্রাব। ঠোঁটের নীচের অংশের স্ফীতি এবং ঠোঁটের মাঝের অংশ ফাটা। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল, শীতকাতুরে তৎসহ ব্যথা। চর্ব্বির মত স্বাদ। মুখগহ্বর শুষ্ক, তৎসহ তৃষ্ণাহীন; অবিরাম মুখগহ্বর ধুতে চায়। ঠোঁটের নীচের অংশের মাঝে ফাটা। জিহ্বা হলুদ অথবা সাদা, তৎসহ চটচটে শ্লেষ্মা দ্বারা ঢাকা।

৫। **রাস-টক্স** ঃ আক্রান্তস্থান টেনে ছিঁড়ার মত ব্যথা, গরম, ফোলা এবং ক্রমাগত নড়াচড়া উপশম। শীতকারত, জিহবা পরিষ্কার অগ্রভাগ ত্রিভূজাকার লাল বর্ণের। প্রচুর তরল মল, রাত্রে অধিক। গলায় টাটানি ব্যথা, গ্রন্থিসমূহ স্ফীত, গিলার সময় খোঁচামারার ন্যায় ব্যথা। পাকস্থলী পাথরের ন্যায় ভারবোধ, মুখে তিক্ত স্বাদ, অত্যধিক পিপাসা, তারসাথে মুখ গলা শুষ্ক। দুধ পান করার ইচ্ছা।

টিটেনাস (Tetanus)

১। প্রশ্ন ঃ টিটেনাস এর সংজ্ঞা দাও।
বা, ধনুষ্টকার কি ?

টিটেনাসের সংজ্ঞা (Definetion of Tetanus) ঃ

টিটেনাস একটি সংক্রামক রোগ যা *Clostridium titani* নামক জীবাণু দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং মাংসপেশীতে প্রচন্ড ব্যথা ও ধনুকের মত বাঁকা এবং চোয়াল 'লক' হয়ে যায়, তাকে টিটেনাস (ধনুষ্টকার) বলে।

২। প্রশ্ন ঃ টিটেনাসের প্রকারভেদ লিখ। ০৮

টিটেনাসের প্রকারভেদ ঃ

(i) জেনারেলাইজড টিটেনাস (Generalized tetanus),
(ii) লোকালাইজড টিটেনাস (Localized tetanus),
(iii) সেফালিক টিটেনাস (Cephalic tetanus),
(iv) স্প্যালনচেনিক টিটেনাস (Splanchnic tetanus),
(v) নিওনেটাল টিটেনাস (Neonatal tetanus),
(vi) মোডিফাইট টিটেনাস (Modified tetanus)।

৩। প্রশ্ন ঃ টিটেনাসের কারণতত্ত্ব লিখ।

টিটেনাসের কারণতত্ত্ব ঃ (ক) মূলকারণ – সোরা

(খ) আনুসাঙ্গিক/উত্তেজক কারণ ঃ (i) জীবাণু – *Clostridium titani*

(ii) বয়স – সকল বয়সে হতে পারে। (iii) লিঙ্গ– উভয়ই সমানভাবে আক্রান্ত হয়। কিন্তু মহিলাদের ডেলিভারীর সময় এবং এবরশনের সময়, শিশুর জন্মের সময় ঝুঁকি বেশি থাকে।

(iv) কর্মক্ষেত্র– কৃষক ও মালি ঝুঁকিপূর্ণ, মরিচাপড়া লৌহার দন্ডের আঘাতের ক্ষত।

(v) Incubation period – 6 – 10 days

(vi) অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা স্থানে হাঁটা, চলাফেরা করা।

(vii) দূর্ঘটনা- আঘাতের ফলে ক্ষত।

৪। প্রশ্ন ঃ টিটেনাসের ক্লিনিক্যাল ফিচার লিখ।
বা, ইহার লক্ষণাবলী লিখ।

টিটেনাসের ক্লিনিক্যাল ফিচার (লক্ষণাবলী) ঃ

(i) কষ্টকর ঢোক গেল, কথা বলতে কষ্ট হবে।

(ii) ঘাড়ের পিছনে এবং পেটে ক্ষতকর ব্যথা।

(iii) জ্বর– ১০০– ১০৩° ফাঃ পর্যন্ত উঠতে পারে।

(iv) মাসলের খিঁচুনী দেখা দেয়, দাঁত কপাটি লেগে যায়, চোয়াল বন্ধ হয়ে যায়।

(v) ধীরে ধীরে হাত-পায়ের পেশীতে প্রচন্ড টান ধরে এবং ঘাড় বেঁকে যায়।

(vi) শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

৫। প্রশ্ন ঃ টিটেনাসের ইনভেস্টিগেশন লিখ।

Investigation :

(1) Blood for TC↑, DC↑, ESR↑, Hb%↓

(2) Discharge or a picea of necrosed tissue culture

৬। প্রশ্ন ঃ টিটেনাসের ভাবীফল লিখ।

টিটেনাসের ভাবীফল ঃ ইহার ভাবীফল ভাল নয়। রোগ সংক্রামনের সাথে সাথে অর্থাৎ রোগীর রোগ লক্ষণ প্রকাশের সাথে সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসা করলে রোগী আরোগ্য হয়। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা না করলে রোগ জটিল রূপ ধারণ করে, এমনকি মৃত্যুবরণ করে।

৭। প্রশ্ন ঃ টিটেনাসের জটিলতা লিখ।

টিটেনাসের জটিলতা ঃ (i) নিউমোনিয়া,
(ii) শ্বাসতন্ত্রের মাংস পেশীর সংকোচন-প্রসারণ, ল্যারিংগো-স্পাজম,
(iii) রেসপিরেটরী অবস্ট্রাকশন, (iv) সায়ানোসিস,
(v) পেরিপেরাল নিউরোপ্যাথি, (vi) হাইপারহাইড্রোসিল।

৮। প্রশ্ন ঃ টিটেনাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও চিকিৎসা সম্পর্কে লিখ। ০৮

টিটেনাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

(i) আরলি ডায়াগনোসিস- ক্লিনিক্যাল ফিচার (লক্ষণাবলী) এর মধ্যমে রোগ নির্ণয় করতে হবে।

(ii) নোটিপিকেশন (বিজ্ঞপ্তিকরণ) এর মধ্যমে জন সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(iii) রোগীকে পৃথকভাবে রাখা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া।

টিটেনাসের চিকিৎসা ঃ

(i) আক্রান্ত স্থান উত্তমভাবে ডেসিং করতে হবে।

(ii) রোগীর রোগ লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতে হবে।

(iii) পর্যাপ্ত পরিমাণ (৩লিটার/দিন) পানি পান করতে হবে।

(iv) পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু খেতে বা ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) নিয়মিত ইলেক্ট্রোলাইট ব্যালেন্স চেক করতে হবে।

৯। প্রশ্ন ঃ টিটেনাসের ব্যবহৃত ৫টি ঔষধের নির্দেশক লক্ষণাবলী লিখ।

টিটেনাসের ব্যবহৃত ৫টি ঔষধের নির্দেশক লক্ষণাবলী ঃ

১। আর্নিকা ঃ আঘাতের কুফল, বহুদিন পুর্বে ঘটে থাকে। পতনজনিত বা যান্ত্রিক কারণে থেঁৎলান ব্যথা, টাটানি বোধ, রক্তপাত, শোনিতধারা নির্গমন ও নাসিকা থেকে রক্তস্রাব। আঘাতজনিত আচ্ছন্ন ভাব। মস্তিষ্কে আঘাত জনিত অবসাদ এবং মস্তিষ্কঝিল্লি প্রদাহ। আঘাত বা অত্যধিক পরিশ্রমজনিত হৃদপিন্ড বিবর্ধন। রোগীর শীতাবস্থার পুর্বে প্রচন্ড পানি পিপাসা, প্রচুর পরিমাণে পানি পান করে, অন্য অবস্থায় তত পিপাসা থাকে না, বেশি পরিমাণ পানি পান করে পরে বমি করে। শীতাবস্থায় রোগীর সর্ব শরীরে কাঁপুনি, মাথা অত্যন্ত গরম ও হাত পা ঠান্ডা।

২। রাসটক্স ঃ আক্রান্তস্থান টেনে ছিঁড়ার মত ব্যথা, গরম, ফোলা এবং ক্রমাগত নড়াচড়ায় উপশম। শীতকারত, জিহ্বা পরিষ্কার অগ্রভাগ ত্রিভূজাকার লালবর্ণের। প্রচুর তরল মল, রাত্রে অধিক। পাকস্থলী

পাথরের ন্যায় ভারবোধ, মুখে তিক্ত স্বাদ, অত্যধিক পিপাসা, তারসাথে মুখ গলা শুষ্ক। দুধ পান করার ইচ্ছা। পালস দ্রুতগতিশীল, দুর্বল, অনিয়মিত, অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হৃৎপিন্ড বিবৃদ্ধি। প্রত্যঙ্গাদি আড়ষ্ট, প্যারালাইসিসযুক্ত, ঠান্ডা ও নির্মল বায়ু সহ্য হয় না, ইহার সংস্পর্শে চর্মে ব্যথা উদ্ভব হয়।

৩। **বেলেডোনা** ঃ মাথাঘোরা তারসাথে বামে বা পিছনের দিকে পড়ে যাবার অনুভূতি, অতি সামান্য সংস্পর্শ যন্ত্রণাদয়ক। মুখমন্ডল লাল, স্ফীত, চকচকে, পেশীসমূহ আক্ষেপিক চঞ্চলতা, স্নায়ুশূল ও রক্তিমাভ। মুখগহবর শুষ্ক, মাড়ীতে স্ফোটক, জিহ্বার কিনারা লাল ও স্ফীত। গলদেশ শুষ্ক, যেন ঝকঝক করতেছে, সঙ্কুচিত বলে মনে হয়, গলাধঃকরণ কষ্টসাধ্য। সন্ধিসমূহ লাল, স্ফীত, চলতে গেলে টলমল করে, স্থান পরিবর্তনশীল বাতের ব্যথা। গ্রীবার গ্রন্থিসমূহ স্ফীত, ইহার পৃষ্ঠদেশে ব্যথা, মনে হয় যেন ভেঙ্গে যাবে।

৪। **হাইপেরিকাম** ঃ ঘুষি বা আঘাতাদির পর ঐ স্থানে কালশিরা পড়লে লিডাম পাল সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। বহুকাল পূর্বে আঘাত পাওয়ার পর যদি ঐ স্থানে বর্ণ বিকৃত বা কালশিরা সবুজবর্ণের হয়ে যায় ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়। কোন স্থানে কাটা, খোঁচা, সূচ, পেরেক বা গজলি ফুটে আহত হলে, স্নায়ুতে আঘাত। ইদুঁর, বোলতা, ভিমরুল, প্রভৃতির দংশনের কুফল। গোড়ালী বা পায়ের পাতা সহজে মচকে যায়।

৫। **লিডাম** ঃ ইহা স্নায়ুসমূহের আঘাতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ- বিশেষ করে হাতের ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং নখের স্নায়ুসমূহের আঘাতের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আঙ্গুলের অগ্রভাগ পিষে যাওয়ার কারণে তীব্র ব্যথা। অস্ত্রোপচারের পরে ব্যবহার যন্ত্রণার উপশম। মেরুদন্ডে আঘাত- পড়ে যাবার ফলে সেক্রামে ব্যথা, ব্যথা মেরুদন্ড বরাবর উপরে উঠে এবং নীচের দিকে পা পর্যন্ত নামে।

ডিপথেরিয়া (Diphtheria)

১। প্রশ্ন ঃ ডিপথেরিয়া বলতে কি বুঝ ? ০৮, ১১, ১২,

ডিপথেরিয়া (Diphtheria) ঃ

ডিপথেরিয়া একটি শ্লেষ্মা ও বায়ুবাহিত জটিল সংক্রামক রোগ যা টনসিল ও স্বরতন্ত্রের উপর পচনশীল কৃত্রিম পর্দা উৎপন্ন হয়ে বিস্তার লাভ করে এবং রক্তের সাথে মিশে ধাতুগত যে বিষাক্ত উপসর্গাদি সৃষ্টি করে, তাকে ডিপথেরিয়া বলে। স্বরতন্ত্রের উপর মেমব্রেনের ক্ষত ও প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং রক্ত ও পূঁজ মিশ্রিত আঠালো লালা নিঃসৃত হয়।

কারণ ঃ ক্রেবস লোপার ব্যাসিলাস নামক এক প্রকার জীবাণু এই রোগের কারণ। শীতকালে ১-৫ বৎসরের শিশুদের, বালক-বালিকাদের ও বয়োজেষ্ঠ্যদেরও হতে পারে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে চুম্বন, হাঁচি-কাশি, খাদ্যপানীয় ইত্যাদির মাধ্যমে রোগ জীবাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

Causative agents- Cornaebacterium diphtheiae,
Incubation period: 2-4 days.

২। প্রশ্ন ঃ ডিপথেরিয়ার শ্রেণীবিভাগ কর।

ডিপথেরিয়ার শ্রেণীবিভাগ ঃ

(ক) রেসপিরেটরী ডিপথেরিয়ার (Respiratory diphtheria) :

(i) ফ্যারিনজিয়াল ডিপথেরিয়ার (Pharyngeal diphtheria).

(ii) ল্যারিনজিয়াল ট্রাকিয়াল ডিপথেরিয়ার (Laryngeal tracheal diphtheria).

(iii) ন্যাজাল ডিপথেরিয়ার (Nasal diphtheria).

(খ) নন-রেসপিরেটরী ডিপথেরিয়ার (Non-respiratory diphtheria)

(i) কিউটেনিয়াস ডিপথেরিয়ার (Cutaneos diphtheria).

(ii) অকুলার ডিপথেরিয়ার (Ocular diphtheria).
(iii) জেনিটাল ডিপথেরিয়ার (Genital diphtheria).

৩। প্রশ্ন ঃ ডিপথেরিয়ার লক্ষণাবলী লিখ। ০৮, ১১, ১২, ১৩

ডিপথেরিয়ার লক্ষণাবলী ঃ

(i) রোগের শুরুতে সামান্য গলা ব্যথার সাথে জ্বর ও নাক দিয়ে পানি পড়ে।

(ii) জ্বর ১০২^0 - ১০৫^0 F পর্যন্ত উঠতে পারে।

(iii) গলার নিচের গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে উঠে, তীব্র ব্যথা, খাদ্য এমন কি পানি পান করলেও গলায় ব্যথা করে।

(iv) জিহবা, তালুর উপর ও টনসিলের পাশ দিয়ে দুধের সরের মত সাদা বড় পর্দা পড়ে।

(v) নাকে আক্রান্ত হলে পূঁজ ও শ্লেষ্মা পড়ে ও গন্ধ হয়।

(vi) মুখ থেকে দূর্গন্ধযুক্ত লালা নিঃসরণ হয়।

(vii) শ্বাসকষ্টে নীলাভ হয়ে যায়।

(viii) রোগী স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না।

(ix) রোগী অস্থির হয়ে পড়ে ও কাঁদতে থাকে।

(x) শ্বাস-প্রশ্বাসে বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

৪। প্রশ্ন ঃ ডিপথেরিয়া রোগের চিকিৎসা লিখ। ১৩

ডিপথেরিয়া রোগের চিকিৎসা ঃ

১। প্রয়োজনে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

২। লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতে হবে। যেমন- ঔষধ ঃ এপিস মেল, আর্সেনিক এলবাম, ল্যাকেসিস, লাইকোপডিয়াম, ফসফরাস, ফাইটোলক্কা, রাস-টক্স, এসেটিক এসিড।

৩। করণীয় – (i) আইসোলেটেড এবং বেড রেষ্ট।

(ii) পুষ্টির অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
৪। নিষেধ – (i) ঠান্ডা ও ঠান্ডা জাতীয় খাদ্য ও পানীয় (ii) শক্ত খাদ্য
৫। পথ্য – (i) শিশুদের মায়ের দুধ নিয়মিত দিতে হবে। (ii) তরল ও অর্ধতরল পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে।

৫। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে ডিপথেরিয়ার প্রতিরোধ ঔষধ কি ?
হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে ডিপথেরিয়ার প্রতিরোধ ঃ

ডিপথেরিয়া রোগের হোমিওপ্যাথিতে যে প্রতিরোধক ঔষধ আছে তার নাম ডিপথেরিনাম এবং রোগ লক্ষণ দেখা দিলে রোগীর রোগের লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা দিতে হবে। যেমন -মার্কসল, ল্যাকেসিস।

৬। প্রশ্ন ঃ ডিপথেরিয়া রোগে কি ধরনের নিদানগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়? বর্ণনা কর।
ডিপথেরিয়া রোগে নিম্ন ধরনের নিদানগত পরিবর্তন সংঘটিত হয় ঃ
(i) ডিপথেরিয়ার জীবাণু আক্রমনের পরে সেখানে একটি মজবুত ফলস মেমব্রেন তৈরি হয়।
(ii) ফলস মেমব্রেন, ফাইব্রিন, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াম সেল ও ডিপথেরিয়া জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট।
(iii) মেমব্রেন ল্যারিংস বা ট্রাকিয়ায় সৃষ্টি হলে তখন ঐ মেমব্রেন দ্বারা শ্বাসনালী প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।
(iv) এই জীবাণু দ্বারা এক্সোটক্সিন উৎপন্ন হয়।
(v) এক্সোটক্সিন রক্তের সাথে মিশে হৃৎপিন্ডের উপর ক্রিয়ার ফলে উহার মাংসপেশীতে ফ্যাটি ডিজেনারেশন উৎপন্ন করার কারণে হৃপিন্ডের স্বাভাবিক আকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
(vi) স্নায়ুর উপর প্রতিক্রিয়ার ফলে উহা নিষ্ক্রীয় বা প্যারালাইজড হয়ে যায়।

৭। প্রশ্ন ঃ ডিপথেরিয়ার ভাবীফল লিখ।

ডিপথেরিয়ার ভাবীফল ঃ

ডিপথেরিয়ার ভাবীফল খারাপ নহে, রোগের শুরুতে রোগ নির্ণয় করে সদৃশ বিধান মতে ঔষধ সেবন করলে রোগী দ্রুত রোগ মুক্ত হয়। অন্যথা বিসদৃশ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে রোগ জটিল আকার ধারন করে এবং রোগীর জীবন সংকটাপন্ন হয়।

৮। প্রশ্ন ঃ মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ কি কি ?

মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ ঃ- মানসিক অসুস্থতার লক্ষণগুলি নিম্নে দেয়া হল- (i) অহেতুক চিন্তা করা।

(ii) সামান্য ব্যাপারে অধিক ভীতিগ্রস্ত হয় এবং হতাশাবোধ করে।

(iii) কোন কাজ করার সময় অহেতুক হাত পায়ের কম্পন ও বুক ধড়ফড় করা।

(iv) সর্বদা উৎকণ্ঠিত ও দুশ্চিন্তা করা।

(v) কোন অজ্ঞাত কারণে মনঃযোগের করতে অপারগতা।

(vi) অহেতুক কারণে সর্বদা অসুখী থাকা।

(vii) অতি সহজেই প্রায়ই স্বাভাবিক মেজাজ হারিয়ে ফেলা।

(viii) নিয়মিতভাবে ঘুম না হওয়া বা নিদ্রাহীনতা ভোগ করা।

(ix) সহজেই মনের ভাবের উঠানামা করে।

(x) লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে সর্বদা অনীহা।

(xi) নিজের সন্তান সন্ততিদের প্রতি ঔদাসিন্যতা প্রদর্শন করা।

(xii) সর্বদাই তিক্ত ব্যবহার করা।

(xiii) অহেতুক ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়া।

(xiv) দৈহিক কোন কারণ ছাড়া একাধিক ব্যথার উপস্থিত হয়।

(xv) অহেতুক ভয় ও চিন্তায় ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া বা মলত্যাগ করা।

(xvi) যাবতীয় ব্যাপারে নিরাশাভাব ও কোন কাজে উৎসাহ না থাকা।

হাম (Measles)

১। প্রশ্ন ঃ হামের সংজ্ঞা দাও।

হামের সংজ্ঞা ঃ

হাম এক ধরনের একিউট ভাইরাল সংক্রামক রোগ যা RNA Paramyxovirus দ্বারা আক্রান্ত হয়, যা অত্যন্ত রুগ্নাবস্থায়, বৈশিষ্ট্যরূপে রোগ লক্ষণ প্রকাশক। পূর্ববর্তী জ্বর, সর্দ্দি, শরীরে ব্যথা এবং অন্তঃস্ফোটিক দ্বারা হামের উদ্ভেদ বুঝা যায়। এই রোগ সাধারণতঃ শিশু ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। এক কথায় হাম হচ্ছে প্যারাম্যাক্স ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট ড্রপলেট সংক্রামক রোগ। রোগীর সংস্পর্শে আসতে তার হাঁচি, কাশির মাধ্যমে সুস্থ দেহে রোগ সংক্রমন হয়।

২। প্রশ্ন ঃ হামের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম এবং সুপ্তিকাল লিখ।

হামের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর নাম ঃ RNA Paramyxovirus.

হামের রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর সুপ্তিকাল ঃ ১৪ দিন।

৩। প্রশ্ন ঃ হামের কারণসমূহ লিখ।

বা, ইহার ছয়টি কারণ লিখ।

হামের কারণতত্ত্ব ঃ

(A) মূলকারণ – (i) সোরা

(B) আনুসাঙ্গিক কারণ ঃ

(i) Age – ৩ – ৮ বছরের শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয়।

(ii) লিঙ্গ – উভয়দের ক্ষেত্রে সমানভাবে দেখা যায়।

(iii) সময় – শীত ও বসন্তকালে বেশি দেখা যায়।

(iv) Agent – RNA Paramyxovirus.

(v) অপুষ্টিজনিত কারণে এ রোগ হতে পারে।

(vi) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের কারণে হতে পারে।

৪। প্রশ্ন ঃ হাম ও জল বসন্তের মধ্যে পার্থক্য কর। ১০, ১৬

হাম ও জল বসন্তের মধ্যে পার্থক্য ঃ

হাম		জল বসন্ত
হামের সুপ্তিকাল ১-২ সপ্তাহ (গড়ে ১৪ দিন)	১	জল বসন্তের সুপ্তিকাল প্রায় ১৫ দিন।
ইহার সংক্রমণকাল ২ সপ্তাহ।	২	ইহার সংক্রোমন কাল ৩ সপ্তাহ।
জ্বরের সাথে লাল বর্ণের র‍্যাস বের হয়।	৩	গুটিকাগুলি সামান্য জ্বরের সাথে বের হয়।
৩/৪ দিনের মধ্য র‍্যাশ সমস্ত দেহে প্রকাশিত হয়।	৪	গুটিকাগুলো ৩/৪ দিন পর্যন্ত ঝাঁকে ঝাঁকে বের হয়।
র‍্যাশ লাল বর্ণের ঘামাচি মত।	৫	গুটিকাগুলোতে নরম ও তরল পদার্থ পূর্ণ থাকে।
র‍্যাশসমূহ প্রথম মুখমন্ডলে প্রকাশ পায়।	৬	বুকে, পিঠে ও মুখে দেখা দেয়।
ইহার র‍্যাশ জ্বরের তীব্রতা সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়।	৭	যেহেতু ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়, সেজন্য একই সময় গুটির বিভিন্ন স্তর দেখা যায়।
প্যারামিক্সো ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়।	৮	হারপিজ জোষ্টার ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়।
ইহা সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যে এপিডেমিক আকারে ছড়ায়, কিন্তু জল বসন্তের মত মারাত্মক নয়।	৯	সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যে এপিডেমিক আকারে ছড়ায়, গুটি বসন্তের মত মারাত্মক না হলেও কষ্টদায়ক।

৫। প্রশ্ন : হামের লক্ষণাবলী লিখ। ০৯, ১১, ১২,
খ. হামের বাহ্যিক লক্ষণাবলী লিখ। ১৪

হামের লক্ষণাবলী /হামের ক্লিনিক্যাল ফিচার :
হামের লক্ষণাবলী ৩টি ধাপে বিভক্ত। যথা-

(১) Prodromal/catarrhal stage :

a) জ্বর, সর্দি কাশির মধ্যে দিয়ে শুরু হয়।

b) কনজাংটিভা লালবর্ণ ধারণ করে, চোখের আইলিড ফোলে যায় এবং চোখ থেকে পানি পড়ে।

c) জ্বর ১০২°F পর্যন্ত হতে থাকে। হাঁচি, আলোকাতঙ্ক, ক্ষুধামন্দা, কেরাটাইটিস, শব্দযুক্ত কাশি ইত্যাদি প্রকাশ পায়।

d) Koplik's spot ⇒ ২য় দিন ৯৫% রোগীর ক্ষেত্রে মুখের ভিতরের মিউকাস মেমব্রেনে কপলিক স্পট দেখা যায়।

⇒ কপলিকস স্পটের চারিদিকে লাল রঙের সরু এরিয়া থাকে।

⇒ চোখের পাতার ভিতরে মিউকাস মেমব্রেনে কপলিক স্পট দেখা যাবে।

⇒ ২য় মোলার দাঁতের বিপরীতে প্যারোটিড ডাক্ট এর চতুর্দিকে কপলিকস স্পট দেখা যাবে।

e) শরীরের লিম্ফনোডগুলি ফুলে যাবে এবং স্প্লিনোমেগালী দেখা দিবে।

f) ৩য় দিনে শরীরের তাপমাত্রা নীচে নেমে আসবে।

(২) বহিঃস্ফোটক/উদ্ভেদ ধাপ :

৩য় – ৪র্থ দিন Macub-popular rash দেখা দেয়।

র‍্যাশের বৈশিষ্ট্য –

a) প্রথম লালবর্ণের কানের পিছনে, কপালে, চুলের মধ্যে র‍্যাস বের হয়।

b) পরবর্তীতে র‍্যাস শরীরের অন্যান্য অঙ্গে প্রকাশিত হয়।

c) র‍্যাসসমূহ পৃথক পৃথক থাকে।

d) দেখতে গোলাপী বর্ণের কিন্তু যখন ইহার উপর চাপ দেয়া হয় তখন র‍্যাসের রং হয় হলুদবর্ণের।

e) পরবতীতে র‍্যাসগুলি একত্রিত হয়ে যায়।

f) কখনো কখনো র‍্যাস থেকে রক্তক্ষরণ হয় এবং সাথে ইন্টারনাল হেমোরেজ হতে পারে।

(৩) রিকভারী ধাপ ঃ

a) জ্বর কমে যাবে।

b) আস্তে আস্তে র‍্যাসসমূহ মিলে যেতে থাকে।

c) চর্ম বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত স্থান হতে ভূষির ন্যায় উঠিতে থাকে।

d) মাংসপেশীর ব্যথা কমে যায়।

৬। প্রশ্ন ঃ হামের ইনভেস্টিগেশন লিখ।

হামের ইনভেস্টিগেশন (Investigation):

(i) Blood for TC↑, DC↑, e) প্রথমে মুখমন্ডলের র‍্যাসগুলি মিলে যায়। Hb% ↓, ESR↑, Leucocytosis

(ii) Sputum or urine culture.

(iii) মিনি টর্চ দ্বারা মুখ গহ্বর পরীক্ষা করলে কপলিস স্পট দেখা যাবে।

৭। প্রশ্ন ঃ হামের জটিলতা লিখ।
বা, হামের ৬টি জটিলতা লিখ। ১৫

হামের জটিলতা ঃ

(১) রেসপিরেটরী – (i) ইডিমা গ্লোটিস (ii) ল্যারিংজাইটিস (iii) ব্রংকাইটিস (iv) ব্রংকোনিউমোনিয়া (v) ফুসফুসের কোলাপ্স (vi) নিউমোনিয়া।
(২) কার্ডিয়াক – (i) এন্ডোকার্ডাইটিস (ii) পেরিকার্ডাইটিস
(৩) অকুলার – (i) কনজাংটিভাইটিস (ii) কর্নিয়াল আলসার (iii) ক্যারাটাইটিস (কার্নিয়ার প্রদাহ)
(৪) এলিমেন্টারী/ডাইজেষ্টিভ– স্টোমাটাইটিস, এন্টারোকোলাইটিস, গ্যাস্ট্রো-এন্টেরাইটিস (পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহ)
(৫) কান– অটাইটিস মিডিয়া
(৬) নার্ভাস – মেনিনজাইটিস
(৭) লিম্ফনোডা– সাপুরেটিভ লিম্ফোডেনাইটিস
(৮) কিডনী– এলবুমিনুরিয়া,
(৯) কনভালশন
(১০) চর্ম – একজিমা

৮। প্রশ্ন ঃ হামের চিকিৎসা আলোচনা কর। ১৫

হামের চিকিৎসা আলোচনা ঃ

(i) রোগীকে বিশ্রামে রাখতে হবে।
(ii) রোগীকে আলাদা রুমে রাখতে হবে।
(iii) রোগীর যাতে ঠান্ডা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
(iv) জ্বর কমানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।
(v) পুষ্টিকর তরল ও অর্ধতরল খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে।
(vi) লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতে হবে।

৯। প্রশ্ন ঃ ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ১২

ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ব্যাকটেরিয়া		ভাইরাস
ব্যাকটেরিয়ার কোষ আবরণী আছে।	১	ভাইরাসের কোষ আবরণী নাই।
ইহা আণুবিক্ষনিক।	২	ইহা অতি আণুবিক্ষনিক।
ইহা সজীব বস্তুর অন্তর্গত, কারণ কোষে প্রোটোপ্লাজম বিদ্যমান থাকে।	৩	ইহা সজীব ও জড় বস্তুর মধ্যবর্তী সত্ত্বা, ইহাতে কোন প্রোটোপ্লাজম নাই।
ইহাকে কেলাস রূপে সংগ্রহ করা যায়।	৪	ইহাকে কেলাস রূপে সংগ্রহ করা যায় না।
ইহা সজীব কোষে এবং বাহিরে বংশ বিস্তার করে।	৫	ইহা শুধুমাত্র সজীব কোষে বংশ বিস্তার করে।
ইহা জল, স্থল, বায়ুমণ্ডল সর্বত্র বিদ্যমান।	৬	ইহা শুধু মাত্র সজীব কোষে বাস করে।
ইহার কোষে সমন্বিত এনজাইম থাকে।	৭	ইহার কোষে একক এনজাইম থাকতে পারে।
ইহার কোষে DNA ও RNA উভয়ই বর্তমান।	৮	ইহার DNA ও RNA পৃথকভাবে উপস্থিত থাকে।
ইহার নিউক্লিয়িক এসিড ক্যাপসিডের মধ্যে থাকে না।	৯	ইহার নিউক্লিয়িক এসিড ক্যাপসিডের মধ্যে থাকে।

১০। প্রশ্ন ঃ ডি-হাইড্রেশন বলতে কি বুঝ ? খাওয়ার স্যালাইনের সুবিধা ও অসুবিধা সমূহ কি কি ?

ডি-হাইড্রেশন ঃ

ডি-হাইড্রেশন হচ্ছে দেহের এমন একটি অবস্থা যেখানে টিস্যুর মধ্যস্থিত ইন্টারসেলুলার ও এক্সট্রাসেলুলার বডি ফ্লুইড স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়। অর্থাৎ দেহে তরল পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পেলে, তাকে ডি-হাইড্রেশন বলে। যেমন- অতিরিক্ত বমি ও উদরাময় হলে দেহে পানি স্বল্পতা দেখা দেয়।

খাওয়ার স্যালাইনের সুবিধাসমূহ ঃ

(i) উপকরণসমূহ সস্তা ও সহজে পাওয়া যায়।
(ii) গ্রামে ঘরে তৈরী করা যায় এবং ব্যবহার করা যায়।
(iii) উদরাময়ে শুরুতে পান করলে দেহে পানি স্বল্পতা দেখা দেয় না।
(iv) পানির পিপাসা দূর হয়।
(v) শরীরের অর্গানিক ও ইনঅর্গানিক উপাদানসমূহ স্বাভাবিক থাকে।

খাওয়ার স্যালাইনের অসুবিধাসমূহ ঃ

(i) দ্রুত প্রতিস্থাপনের জন্য উপযুক্ত নয়।
(ii) শক থাকলে সেবন করানো যায় না।
(iii) রোগী দূর্বল হয়ে যায়।
(iv) এক পেকেট খাওয়ার স্যালাইনে ৫০০ মিলিলিটারের বেশী বা কম পানি মেশানো হলে কার্যকারীতা নষ্ট হয়।
(v) সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে কমবেশী করা বা নিয়ন্ত্রণ করা কষ্ট সাধ্য।

১১। প্রশ্ন ঃ একজন আদর্শ স্বাস্থ্যকর্মী হতে হলে কি কি নিয়ম-কানুনসমূহ মেনে চলতে হবে ?

একজন আদর্শ স্বাস্থ্যকর্মী হতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ম-কানুনসমূহ মেনে চলতে হবে ঃ

(i) সাধারণ মানুষের স্তরে গিয়ে কাজ করতে হবে।

(ii) সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে হবে এবং নিজের বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিসমূহকে তাঁদের বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ণনা করতে হবে।

(iii) সাধারণ মানুষের কাজকর্ম থেকে শিক্ষণীয় কিছু থাকলে তা আয়ত্ত্ব করার চেষ্টা করতে হবে।

(iv) গ্রাম্য চিকিৎসা বা গ্রামীণ আরোগ্য বিধানগুলি সর্বক্ষেত্রে বাতিল বা গ্রহনযোগ্য বলে মনে করা ঠিক নয়।

(v) অসুস্থ্য অবস্থায় প্রত্যেক মানুষই অতিরিক্ত সেবা-শুশ্রুষা পেতে চায়, কাজেই এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। রোগী ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সব সময় বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। একটু হাসিযুক্ত সান্ত্বনা রোগারোগ্যে ঔষধের চেয়ে বেশি কাজ করে।

(vi) সাধারণ স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্বন্ধে অন্যকে যা উপদেশ দেয়া হবে তা নিজেকেও পালন করতে হবে।

(vii) পরিবেশকে রোগমুক্ত রাখতে হলে আগে রোগের মূল কারণগুলির দিকে নজর দিতে হবে এবং সেগুলির প্রতিকার বা নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন – বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীর ব্যবস্থা করা, মায়ের দুধ ও শাক-সজির গুরুত্ব প্রচার করা প্রভৃতি।

১২। প্রশ্ন ঃ রোগ সংক্রমন নিবারণের উপায় কি ? বা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

রোগ সংক্রমন নিবারণ ঃ

রোগ সংক্রমন নিবারণ করতে পারলে সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারবে না এবং কেউ রোগাক্রান্ত হবে না। তাই সংক্রামক রোগ যেন ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

নিম্নে নিবারণের ব্যবস্থাগুলি দেয়া হল ঃ-

(i) বিজ্ঞপ্তিকরণ (Notification) ঃ কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, টাইফয়েড ইত্যাদি গুরুতর রোগ দেখা মাত্র স্বাস্থ্য বিভাগকে সংবাদ দিতে হবে। জনস্বাস্থ্য বিভাগ সাথে সাথে রোগ নিবারণের ব্যবস্থা করলে সংক্রমনের ব্যাপকতা থেকে জনগোষ্ঠী রক্ষা পাবে।

(ii) স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation) ঃ সংক্রমিত রোগীকে আলো বাতাস পূর্ণ আলাদা ঘরে রাখতে হবে এবং অবাধ মেলা মেশা বন্ধ করতে হবে। কেবল মাত্র ডাক্তার ও সেবিকা স্বাস্থ্য সম্মত নিয়ম পালন করে দেখাশুনা করবে অথবা হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিতে হবে।

(iii) সঙ্গরোধকরণ (Quarantine) ঃ রোগীর সংস্পর্শে আসা অথবা একই বাড়িতে বসবাসরতদের মধ্যে ইতিমধ্যে জীবাণু প্রবেশ করেছে মনে হলে তাদেরকে অন্য লোকদের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ন্ত্রন করতে হবে। যে পর্যন্ত না রোগের সর্বোচ্চ সুপ্তিকাল অতিবাহিত হয়, ইহাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক) যে গৃহে সংক্রমন হয়েছে তাদের সুপ্তিকাল উত্তীর্ণ পর্যন্ত জন সাধারণের সাথে মিশতে না দেওয়া।

খ) সংক্রামক ব্যাধির এলাকা হতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে আসা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

গ) এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেন সংক্রমন ছড়াতে না পারে তাই সংক্রমিত দেশের পর্যটকদের অন্যদেশের সরকার তাঁদের প্রবেশে বিধি আরোপ করেন।

(iv) বিশোধন (Disinfection) ঃ রোগ জীবাণু ধ্বংস করার পদ্ধতিকেই বিশোধন বলা হয়। বিশোধন তিন পদ্ধতিতে করা যায়।

ক) প্রাকৃতিক উপায় ঃ সূর্য কিরণ ও বায়ু দ্বারা।

খ) উত্তাপ দ্বারা ঃ পুড়িয়ে, গরম পানিতে ফুটিয়ে, উত্তপ্ত বায়ু বা বাষ্প দ্বারা।

গ) রাসায়নিক উপায়ে ঃ রাসায়নিক পদার্থ যা জীবাণু বিনষ্ট করে কি জিনিসপত্র নয়। যেমন- চুনাপাথর, ব্লিচিং পাউডার, ফরমালিন ফিনাইল, ডেটল ইত্যাদি।

(v) দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ টিকাদান কর্মসূচী গ্রহনে মাধ্যমে সংক্রামক রোগ নিবারণ করা যায়।

(vi) স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ঃ রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র, পোষ্টার, সিনে ও বক্তৃতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(vii) স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা (Sanitation) ঃ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

উপরিউক্ত মাধ্যমে সংক্রামক রোগ অনেকাংশে দূর ক সম্ভব।

নবম অধ্যায়
পরিবার পরিকল্পনা (Family Planing)

১। প্রশ্ন ঃ পরিকল্পিত পরিবার বলতে কি বুঝ ? বাংলাদেশে ইহার গুরুত্ব লিখ। ১০,

অথবা, পরিবার পরিকল্পনা বলতে কি বুঝ? বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর ? ০৯, ১১, ১৫

পরিবার পরিকল্পনা (Family Planing) ঃ

পরিকল্পনা অর্থ পূর্ব হতে চিন্তা করে সে মত কাজ করা। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিবেচনা করে যে পরিবার গঠন করা হয়, তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে। পরিবারের ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনার একটি বড় দিক হল কয়টি সন্তান হবে এবং কত সময়ের ব্যবধানে হবে তা আগে হতে স্থির করে নেয়া ও সেভাবে কাজ করা।

পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ঃ

অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত এ দুই কারণে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহন করার প্রয়োজন রয়েছে।

(i) **অর্থনৈতিক সুবিধা ঃ** পরিবারের ভরণ-পোষণ ও পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। যদি সন্তানের সংখ্যা কম থাকে তবে অল্প আয়েই তাদের ভরণ পোষণ, লেখা পড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়।

(ii) **খাদ্য ঃ** ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে জমির পরিমাণ বাড়ছে না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য ঘরবাড়ী নির্মানের কারণে চাষের জমি কমে যাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ ইত্যাদির কারণে ফসল কম হয়। ফলে দুই বেলা খাবার জোটান কষ্টকর, সেখানে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া তো সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে পারলে খাদ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সম্ভব হবে।

(iii) পোষাক ঃ মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পোশাক পরিচ্ছেদ একটি প্রয়োজনীয় বিষয়, সুতারং পরিবারের সদস্য সংখ্যা যদি কম হয় তা হলে ভাল পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধান করতে পারে।

(iv) বাসস্থান ঃ খাদ্য, বস্ত্রের পরেই মানুষের বাসস্থানের প্রয়োজন। যাদের সংসারে লোক সংখ্যা কম তারা সাংসারিক প্রয়োজন মেটানোর পর টাকা-পয়সা জমিয়ে বসবাসের জন্য আদর্শ বাড়ীঘর তৈরী করতে পারেন।

(v) **শিক্ষা** ঃ সন্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা করা প্রত্যেক পিতা-মাতার কর্তব্য। অল্প আয় এবং পরিবারের লোক সংখ্যা বেশি হলে তা একেবারে অসম্ভব। তাই লোক সংখ্যা কম হলে সন্তান শিক্ষিত করা সম্ভব।

(vi) **সামাজিক অবস্থা** ঃ বর্তমানে বাংলাদেশের লোক সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাকে সীমিত করতে না পারলে অদুর ভবিষ্যতে ইহার ফলে কেবল বেকারত্ব বাড়বে না, সর্বত্র সামাজিক অশান্তির কারণও হবে। তাই সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নতি করতে হলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করা অতীব জরুরী।

(vii) **স্বাস্থ্যগত কারণ** ঃ মায়ের স্বাস্থ্য- মাকে সংসারের বেশী দায়িত্ব পালন করতে হয়, তাই মাকে ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ও পরিশ্রমী হওয়া প্রয়োজন।

(viii) ঘন ঘন সন্তান জন্মদানে মা পুষ্টিহীনতায় ভুগে এবং অপুষ্ট সন্তান জন্ম দেন। তাই মায়ের স্বাস্থের দিকে খেয়াল রেখে দুটো সন্তানের বেশী জন্ম না দেয়াই সর্বোত্তম।

(ix) **পিতার স্বাস্থ্য** ঃ অধিক সন্তানের ভরণ-পোষণ যোগাড় করতে অত্যধিক পরিশ্রম ও সেই সাথে অধিক চিন্তার কারণে পিতার স্বাস্থ্য ও মন দুটোই নষ্ট হয়ে যায়।

(x) **শিশু স্বাস্থ্য** ঃ মাতা অধিক সন্তান জন্মদানের কারণে সুস্থ সন্তানের বদলে রুগ্ন সন্তান জন্ম দেন। কারণ মাতা নিজেই অপুষ্ট থাকেন। আর

এই রুগ্ন সন্তান পরিবার ও দেশের বোঝা। তাই পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে উপযুক্ত বিরতির দ্বারা সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দানই বুদ্ধিমানের কাজ।

অতএব, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত এই দুই কারণের জন্যে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২। প্রশ্ন ঃ পরিবার পরিকল্পনার সুফলগুলো লিখ ? ০৯, ১১, ১৩, ১৭

পরিবার পরিকল্পনার সুফলসমূহ ঃ

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবার পরিকল্পনার সুফলের দিকগুলো নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

(ক) স্বাস্থ্যগত সুফল ঃ

(i) মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।
(ii) দুশ্চিন্তার পরিবর্তে মানসিক শান্তি বজায় থাকে।
(iii) মায়ের ঘন ঘন সন্তান প্রসবের ভয় থাকে না।
(iv) সংসার আনন্দময় হয়।

(খ) অর্থনৈতিক সুফল ঃ

(i) ভালভাবে থাকা খাওয়া যায়।
(ii) বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয় করা যায়।
(iii) সমাজে সম্মান পাওয়া যায়।
(iv) সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে কলহ কমে যায়।

(গ) পারিবারিক সুখ ঃ

(i) সন্তানকে যত্ন করা এবং লেখা পড়া শিখানো যায়।
(ii) বাড়ি ঘরে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলা যায়।
(iii) পরিবারের সাথে এবং সন্তানদের সাথে বেশি সময় কাটানো যায়।
(iv) স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে মিল মহব্বত তৈরী হয়।
(v) দাম্পত্য জীবন সুখের হয়।

(ঘ) নিজেদের মঙ্গল ঃ

স্বামী স্ত্রী উভয়ে কাজ করে উভয়কে সহযোগীতা করতে পারে। ছেলে-মেয়েরা লেখা পড়া করে ও উপার্জন করলে পরিবারের মার্যাদা বাড়ে।

(ঙ) দেশের মঙ্গল ঃ

পরিবারের সদস্য সংখ্যা কম থাকলে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদার সমস্যা সীমিত থাকে। ফলে সরকার-

(i) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে পারে।

(ii) দেশের আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয়।

সর্বোপরি ব্যক্তির উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমেই পরিবার পরিকল্পনার প্রকৃত সুফল পাওয়া যায়।

৩। প্রশ্ন ঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটি অস্থায়ী পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখ। ০৮,

বা, জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটি অস্থায়ী পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখ। ১০

জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি অস্থায়ী পদ্ধতি সংক্ষেপে ঃ

ডায়াফ্রাম ঃ ডায়াফ্রাম হচ্ছে পাতলা নরম রাবারের তৈরী গভীর পেয়ালার আকৃতি বিশিষ্ট ঢাকনা বিশেষ। ইহার চর্তুপার্শ্বের প্রান্তে একটি ধাতু নির্মিত নরম স্প্রিং লাগানো থাকে। ২-৩ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত বিভিন্ন মাপের ডায়াফ্রাম পাওয়া যায়। ইহা জরায়ুর মুখে পড়িয়ে দিলে বীর্য জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। সহবাসের ৬-৮ ঘন্টা পরে খুলে ধুয়ে রাখতে হয়। ইহাকে এভাবে অনেক দিন ব্যবহার করা।

৪। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির উদ্দেশ্য কি? ০৮, ১০, ১২, ১৪

বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির উদ্দেশ্য ঃ

(i) দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ করা।
(ii) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন।
(iii) অনাকাঙ্খিত জন্ম এড়িয়ে চলা।
(iv) কাঙ্খিত জন্ম প্রাপ্তি।
(v) দুইটি গর্ভধারনের মাঝে বিরতি নিয়ন্ত্রন।
(vi) সন্তান জন্মদানের সময় নিয়ন্ত্রন ও নির্ধারন।
(vii) পরিবারের সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা।
(viii) পরিবারের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়ণ।
(ix) মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুস্থ্য এবং রোগমুক্ত রাখা।
(x) গর্ভপাত হ্রাস করা।
(xi) মা ও শিশুর অকাল মৃত্যুর হার কমানো।
(xii) খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করা।
(xiii) পরিবারের লোক সংখ্যা সীমিত রাখা এবং
(xiv) যে সকল দম্পতি সন্তান জন্মদানের অক্ষম, সে সব দম্পতির সন্তান লাভের যথাযোগ্য উপদেশ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা।

৫। প্রশ্ন ঃ পরিকল্পিত পরিবার বলিতে কি বুঝ? ইহার পদ্ধতিগুলির নাম লিখ। ০৮

পরিবার পরিকল্পনা (Family Planing) ঃ

পরিকল্পনা অর্থ পূর্ব হতে চিন্তা করে সে মত কাজ করা। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিবেচনা করে যে পরিবার গঠন করা হয়, তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে। পরিবারের ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনার একটি বড় দিক হল কয়টি সন্তান হবে এবং কত

সময়ের ব্যবধানে হবে তা আগে হতে স্থির করে নেয়া ও সেভাবে কাজ করা।

পরিকল্পিত পরিবার পদ্ধতিগুলির নাম ঃ

(i) মেকানিক্যাল পদ্ধতি ঃ ক) ডায়াফ্রাম খ) সার্জিক্যাল ক্যাপ, গ) কনডম, ঘ) আই. ইউ. সি. ডি।

(ii) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ (ক) ফোম ট্যাবলেট, (খ) ক্রীম, (গ) হরমোনাল ট্যাবলেট,

(iii) সার্জিক্যাল ঃ (ক) ভ্যাসেকটমি, (খ) টিউবেকটমি বা লাইগেশন, (গ) সার্জিক্যাল ক্যাপ, (ঘ) কপার- T, (ঙ) নরপ্লান্ট।

৬। প্রশ্ন ঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কত প্রকার ও কি কি ? ০৯
বা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কত প্রকার ও কি কি ? লিখ। ১৭

জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিকতা বজায় রেখে যে সমস্থ প্রক্রিয়া দ্বারা গর্ভনিরোধ করা হয়, তাকে গর্ভনিরোধ বা জন্ম নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি বলা হয়।

পদ্ধতিসমূহ ঃ জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতিসমূহকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ A) অস্থায়ী পদ্ধতি এবং B) স্থায়ী পদ্ধতি।

A) অস্থায়ী পদ্ধতি ঃ

(i) মেকানিক্যাল পদ্ধতি ঃ ক) ডায়াফ্রাম। খ) সার্জিক্যাল ক্যাপ। গ) কনডম। ঘ) I. U. D, ঙ) কপার টি।

(ii) রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ

(ক) ফোম ট্যাবলেট, (খ) ক্রীম, (গ) খাওয়ার বড়ি, (ঘ) ইনজেকশন।

(iii) ফিজিওলজিক্যাল পদ্ধতি ঃ

(ক) নিরাপদ কাল বা রিদম মেথড। (খ) ব্যসাল টেম্পারেচার মেথড।

B) স্থায়ী পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক) ভ্যাসেকটমী। খ) টিউবেকটমী বা লাইগেশাম।

৭। প্রশ্ন ঃ একটি আদর্শ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত ?

একটি আদর্শ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত ঃ

(i) গর্ভনিরোধ প্রায় ১০০ ভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়।

(ii) যৌন উপভোগ অব্যাহত থাকে।

(iii) ইহা সস্তা ও সহজলভ্য হতে হবে।

(iv) ইহা ব্যবহারে বা গ্রহনে কোনরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকবে না।

(v) ইহা সন্তান ধারণের ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করবে না।

(vi) ইহা ব্যবহারে সহজ হতে হবে।

(vii) ইহা ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকতে হবে।

(viii) ইহা দেহে মেদ বৃদ্ধি করবে না।

৮। প্রশ্ন ঃ কোন ধরনের মহিলাদের জন্য আই. ইউ. সি. ডি আদর্শ জন্মনিরোধক পদ্ধতি ? ১৩, ১৫, ১৭

আই. ইউ. সি. ডি. আদর্শ জন্মনিরোধক পদ্ধতি ঃ

আই. ইউ. সি. ডি. প্লাষ্টিকের তৈরী একটি আদর্শ জন্মনিরোধক উপকরণ যা দেখতে ইংরেজী 'S' অক্ষরের মত বাঁকানো। ইহা জরায়ুর ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। জরায়ুর ভিতরে ইহা গর্ভসঞ্চারে বাধা সৃষ্টি করে। ইহা সহজে পড়ানো ও খুলে নেয়া যায়। সুতরাং ইহা সন্তান উৎপাদনক্ষম সকল মহিলাদের আদর্শ জন্মনিরোধকারী পদ্ধতি।

৯। প্রশ্ন ঃ কোন ধরনের ব্যক্তিবর্গ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ ব্যবহারের উপযুক্ত নয় ?

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ ব্যবহারের উপযুক্ত নয় ঃ

(i) পিউবার্টির পূর্বে।

(ii) যক্ষ্মা বা টিউবারকুলোসিসরোগের ক্ষেত্রে।

(iii) উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন থাকলে।
(iv) হার্ট ডিজিজ থাকলে।
(v) মানসিক রোগগ্রস্ত হলে।
(vi) ডায়বেটিস ও নেফ্রাইটিস রোগ থাকলে।
(vii) গর্ভাবস্থায় ও মেনোপোজের পর।
(viii) ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হলে।

১০। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে নিম্নহারে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের কারণসমূহ কি কি ?

বাংলাদেশে নিম্নহারে জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি ব্যবহারের কারণসমূহ ঃ
(i) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রেরণার অভাব।
(ii) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপকরণসমূহের সরবরাহের অপ্রতুলতা।
(iii) জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ধর্মীয় গোড়ামী।
(iv) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার অভাব বা অজ্ঞতা।
(v) জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উপর সরকারের দুর্বল নীতিমালা।

১১। প্রশ্ন ঃ কনডম ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?

সুবিধা ঃ- (i) ইহা ব্যবহার করা সহজ।
(ii) ইহা সস্তা ও সহজ প্রাপ্য।
(iii) ইহা ব্যবহারে কোন উপসর্গ দেখা দেয় না।
(iv) ইহা অনেকটা নিশ্চিত।
(v) নব বিবাহিতরাও ইহা ব্যবহার করতে পারে।

অসুবিধা ঃ

(i) ব্যবহারের সময় ছিঁড়ে যাতে পারে বা পিছলে যেতে পারে।
(i) যৌন- উপভোগ সম্পূর্ণ হয় না। ইহাতে যৌন তৃপ্তি বা আনন্দ ব্যাহত হয়।

১৪। প্রশ্ন ঃ হোমিওপ্যাথিক মতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

হোমিওপ্যাথিক মতে জন্মনিয়ন্ত্রণের ঔষধ ঃ-

হোমিওপ্যাথিক প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিজ্ঞান। ইহাতে প্রাকৃতিক নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। সন্তান জন্মগ্রহণ করা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়ম। যদিও জন্মনিয়ন্ত্রণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের নীতির পরিপন্থী তথাপি মানব কল্যাণের জন্য হোমিওপ্যাথিতেও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। হোমিওপ্যাথিক অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে ন্যাট্রাম মিউর, প্লাম্বার-মেট, এপিস মেল প্রভৃতি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ শীঘ্র গর্ভধারণের ক্ষমতা নষ্ট করে। তন্মধ্যে নেট্রাম-মিউর ঔষধ সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। ইহা দীর্ঘ দিন ব্যবহার করলেও কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না অথচ গর্ভ বন্ধ থাকে। তবে হোমিওপ্যাথিক নেট্রাম-মিউর অপেক্ষা বায়োকেমিক নেট্রাম-মিউর সেবন করা অধিক নিরাপদ ও ফলপ্রসূ।

ঔষধ সেবনবিধি ঃ-

মাসিক শুরু হওয়ার দিনকে প্রথম দিন ধরে মাসিকের পঞ্চম দিন হতে পরবর্তী মাসিক না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় নেট্রাম-মিউর ৩x ছয়টি ট্যাবলেট সামান্য গরম জলসহ বা শুধু মুখে চুষে খেতে হবে। প্রথম এক মাস এভাবে খাওয়ার পর দ্বিতীয় মাসে প্রতি সন্ধ্যায় নেট্রাম-মিউর ৬x ছয়টি ট্যাবলেট সেবন করতে হবে। তৃতীয় মাসে নেট্রাম-মিউর ৬x পাঁচটি ট্যাবলেট এবং চতুর্থ মাসে নেট্রাম মিউর ৩০x পাঁচটি ট্যাবলেট প্রতি সন্ধ্যায় সেবন করতে হবে। তারপর পঞ্চম মাসে মাসিকের পঞ্চম দিনে সন্ধ্যায় হোমিওপ্যাথিক নেট্রাম-মিউর ১০০০ শক্তি এক মাত্রা সেবন করতে হবে। ঐ মাসে আর কোন ঔষধ সেবন করতে হবে না। ষষ্ঠ মাস থেকে পুনরায় প্রথম মাসের ন্যায় পূর্বোক্ত নিয়মে সেবন করতে হবে। ভুলবশতঃ ২/১ দিন ঔষধ সেবন না করলে ক্ষতি হয় না।

পার্শ্ব ক্রিয়ার প্রতিকার ঃ

ক্রমাগত ঔষধ সেবনে যদি ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধি পায় তবে সিপিয়া ৩০ বা ক্যাম্ফর ৩ দুই ঘন্টা অন্তর ৩/৪ মাত্রা সেবন করতে হবে। যদি উদরাময় দেখা দেয়, তবে ফেরাম ফস ৩x তিনটি ট্যাবলেট ও কেলি ফস ৩x ৩টি ট্যাবলেট এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করতে হবে। মাঝে মাঝে নেট্রাম-সালফ ৩x সেবন করানো যায়।

১২। প্রশ্ন ঃ ডায়াফ্রাম ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা লিখ।

ডায়াফ্রাম ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা ঃ

সুবিধা ঃ- (i) ইহা ঠিকমতো ব্যবহারে প্রচুর কর্মক্ষম ও সুফলপ্রদ।

(ii) একটি বহুদিন ব্যবহার করা যায়।

(iii) যোনির রেট্রোভার্সন থাকলেও ইহা ব্যবহার করা যায়।

অসুবিধা ঃ

(i) যোনি পথের পেশী ঢিলা হলে ইহা ব্যবহার করতে পারে না।

১৩। প্রশ্ন ঃ খাওয়ার ঔষধ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা লিখ।

খাওয়ার ঔষধ ব্যবহারের সুবিধা ঃ

(i) ইহা ব্যবহারে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রায় নিশ্চিত হয়।

(ii) ইহা সন্তান ধারণের ক্ষমতাকে স্থায়ীভাবে প্রভাবিত করে না, ব্যবহার বন্ধ করলেই সন্তান ধারণ করা সম্ভব।

(iii) ইহা সকলেই ব্যবহার করতে পারে।

(iv) দাম খুব বেশী নয়।

খাওয়ার ঔষধ ব্যবহারের অসুবিধা ঃ

(i) দৈবক্রমে একদিন বা দুইদিন ঔষধ খেতে ভুলে গেলে বিপদ হতে পারে।

(ii) অনেক দিন ব্যবহারে শরীরের ওজন বেড়ে যায়, খাওয়ার রুচি থাকে না, বমিবমি ভাব হয়, মাথা ঘোরে, স্তনে ব্যথা হয় এবং দুধ কমে যায় ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

১৫। প্রশ্ন ঃ দেহে খাদ্য উপাদান খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা ঃ

দেহ গঠনে ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণে খাদ্য উপাদান পদার্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ উদ্ভিজ জাতীয় খাদ্যেই খনিজ পদার্থ বেশী থাকে। প্রতিদিন মলমূত্র ও ঘামের সঙ্গে কিছু কিছু খনিজ পদার্থ বাহির হয়ে যায়। প্রতিদিনের খাদ্য দ্বারা এই অভাব পূরণ করতে হয়। দেহের খনিজ লবণগুলি মৌলিক খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

খনিজ পদার্থে দেহ গঠন করে ঃ

(i) ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাঁড় ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে। দাঁতের শক্ত আবরণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগ্নেসিয়াম দিয়ে তৈরী। দাঁতে অল্প পরিমাণে ক্লোরিন থাকে।

(ii) লৌহ ও ফসফরাস মাংসপেশী, গ্রন্থি ও স্নায়ুকোষ এবং বিভিন্ন কোষ গঠন করে।

(iii) লৌহ ও তামা রক্তের হিমোগ্লোবিন্ গঠন করে।

(iv) গন্ধক আমাদের চুল, নখ ও চর্মের গঠন এবং পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয়।

(v) বিভিন্ন খনিজ পদার্থ দেহের নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থিরস উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। যেমন- আয়োডিন, থাইরয়েড গ্রন্থির রস থাইরক্সি প্রস্তুতে সাহায্য করে। ক্লোরিন পাকস্থলীর রস এবং সোডিয়াম অন্ত্রের রস প্রস্তুতে সাহায্য করে।

আভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণে ঃ-

(i) খনিজ পদার্থ রক্ত ও শরীরের অন্যান্য তরল পদার্থের মধ্যে চাপের সমতা বজায় রেখে দেহকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখে।

(ii) সোডিয়াম ও পটাসিয়াম দেহের দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

(iii) খনিজ পদার্থ প্রোটিন দ্রবণে সাহায্য করে।

(iv) ক্যালসিয়াম রক্ত জমাট বাঁধার কাজে সাহায্য করে।

(v) খনিজ পদার্থ দেহের অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করে।

(vi) আয়োডিন দেহের বিপাকে সাহায্য করে।

(vii) ম্যাগ্নেসিয়াম এনজাইমের বিপাকে সাহায্য করে।

(viii) কোবাল্ট ভিটামিন বি$_{১২}$ এর প্রধান উপাদান। মানবদেহের রক্ত কোষ গঠনে ভিটামিন বি$_{১২}$ এর বিশেষ প্রয়োজন।

(ix) দস্তা জারক রস প্রস্তুতে সাহায্য করে।

(x) ক্লোরিন পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরী করে পরিপাকে সাহায্য করে।

১৬। প্রশ্ন ঃ মানবদেহে পানির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

মানবদেহে পানির প্রয়োজনীয়তা ঃ

নিম্নলিখিত কারণে মানবদেহে পানির প্রয়োজন রয়েছে।

(i) ইহা সকল প্রকার পুষ্টিকর দ্রব্যাদি দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করে নেয়।

(ii) ইহা রক্তের তরলতা বজায় রাখে এবং ইন্টারসেলুলার ফ্লুইডের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

(iii) ইহা দেহের বর্জ্য পদার্থগুলিকে কিডনীর মাধ্যমে প্রস্রাবরূপে এবং চর্মের মাধ্যমে ঘামরূপে বাহির করে দেয়।

(iv) খাদ্য দ্রব্য হজম ও শোষণের জন্য পানির একান্ত প্রয়োজন।

(v) ইহা শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখে।

(vi) দেহের যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়ায় ইহা মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

দশম অধ্যায়
ডেমোগ্র্যাফি বা জনমিতি
(Demography)

১। প্রশ্ন ঃ জনমিতির ব্যাখ্যা দাও। ১১

জনমিতির ব্যাখ্যা ঃ

জনমিতি এর ইংরেজী শব্দ হল "Demography"। Demos অর্থ জনগন আর graph অর্থ চিত্র অর্থাৎ জনগনের চিত্র। জনমিতি বলতে জনগন সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান অর্জনকে বুঝায়। মূলত জনমিতি হল জনসংখ্যার আকার বৃদ্ধি, বয়স, আঞ্চলিক বণ্ঠন, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ ও আঞ্চলিক স্থানান্তর বিষয়ক জ্ঞান। (Demography is the scientific study of human population)। জনমিতি বলতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে অধ্যায়ন ও গবেষণা করাকে বুঝায়।

জনমিতির বিষয়গুলো হল ঃ

(i) প্রজনন ক্ষমতা (Fertility)
(ii) মৃত্যু হার (Mortality)
(iii) বিবাহ (Marriage)
(iv) দেশান্তর গমন (Migration)
(v) সামাজিক গতিশীলতা (Social mobility)

মূলতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ও কারণ, জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক, উচ্চ জন্ম ও মৃত্যু হারের কারণ ও সমাধান, জনসংখ্যার প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অধ্যায়ন, আলোচনা ও গবেষণা করা জনমিতির অর্ন্তভূক্ত।

২। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে জনমিতির ব্যবহার লিখ।

বাংলাদেশে জনমিতির ব্যবহার (Uses of Demography) ঃ

জনমিতির সাম্প্রতিক তথ্যসমূহ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

(i) সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে।

(ii) ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে।

(iii) শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে।

(iv) জনসংখ্যা ও সামাজিক বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে।

(v) সমাজে সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে।

৩। প্রশ্ন ঃ জনমিতিক চক্র এর বর্ণনা কর।

জনমিতিক চক্র এর বর্ণনা ঃ

জনমিতিক চক্রের ৫টি পর্যায় রয়েছে যার মধ্য একটি জাতি অতিক্রম করতে পারে।

(i) উচ্চমাত্রার স্থির পর্যায় (First stage - High Stationary) ঃ এ পর্যায় উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার হওয়ায় জনসংখ্যা স্থির থাকে। ভারত ১৯২০ সাল পর্যন্ত এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(ii) প্রাথমিক সম্প্রসারণ পর্যায় (Second stage - Early Expanding) ঃ এ পর্যায়ে মৃত্যুহার কমতে থাকে কিন্তু জন্মহার অপরিবর্তিত থাকে ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দক্ষিন এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশই পর্যায় অবস্থান করছে।

(iii) বিলম্বিত সম্প্রসারণ পর্যায় (Third stage – Late Expanding) ঃ এ পর্যায় মৃত্যুহার কমতে থাকে এবং জন্মহারও কমতে থাকে। এ পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় কারণ মৃত্যুহারের তুলনায় জন্মহার বেশী।

(iv) নিম্ন স্থির পর্যায় (Fourth stage -Low Stationary) ঃ এ পর্যায়ে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায়। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থির হয়ে যায়। যেমন- যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, সুইডেন, বেলজিয়াম ইত্যাদি দেশ বর্তমানে এ পর্যায়ে অবস্থান করছে।

(v) অবনতি পর্যায় (Fifth stage - Declining) ঃ এ পর্যায় মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার কম হওয়ায় জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। যেমন- জার্মানী, হাঙ্গেরী ইত্যাদি দেশ বর্তমানে এ পর্যায় অবস্থান করছে।

৪। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে জনমিতির উৎস কি কি ?
(Qus. What are the Sources of Demographic statistics in Bangladesh?)

বাংলাদেশে জনমিতির উৎস (Sources of Demography) **ঃ**

(i) প্রধান উৎস হচ্ছে আদমশুমারী।

(ii) পরিসংখ্যান ব্যুরোর মুখ্য রেজিষ্ট্রেশন,

(iii) ন্যাশনাল সিম্পল জরিপ।

(iv) বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডি।

(v) আই, সি, ডি, ডি, আর, বি - এর ডেমোগ্রাফিক সারভিউলেন্স।

(vi) নিপোর্ট কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের জনমিতিক, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জরিপ।

(vii) হেলথ ম্যানপাওয়ার ডাটা।

(viii) ইন্টারন্যাশনাল পরিসংখ্যানসংক্রান্ত রেকর্ডস।

(ix) ইপিডেমিওলজিক্যাল সারভিউলেন্স।

(x) হসপিটাল রেকর্ডস।

৫। প্রশ্ন ঃ জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কাকে বলে? জনসংখ্যা বিস্ফোরণের প্রভাবসমূহ লিখ।

(Qus. What is population explosion? What are the effects of population explosion.)

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঃ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বলতে বুঝায় দ্রুত গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার যা ২.৫% এর পৌঁছায়।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণের প্রভাবসমূহ ঃ

ক) জাতির উপর প্রভাব ঃ খাদ্যের অভাব, নিম্ন অর্থনীতি, বাসস্থানের সমস্যা, বস্ত্রের সমস্যা, চাকুরীর সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অসামাজিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়, নিম্নমানের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সংক্রামক রোগের সমস্যা ইত্যাদি।

খ) পরিবারগত অসুবিধা ঃ খাদ্যের অভাব, দারিদ্রতা, বাসস্থানের অভাব, শিক্ষার সমস্যা, পিতা-মাতার স্বাস্থ্যের সমস্যা, পারিবারিক অশান্তি।

গ) শিশু ও মায়ের সমস্যাঃ প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার বৃদ্ধি পায়, সেনিটেশন সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা এবং নিম্নমানের জীবনযাত্রা ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে উচ্চ জন্মহারের কারণ কি কি ?
বা বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফ্যাক্টরসমূহ কি কি ?
(Qus. What are the causes of population explosion in bangladesh? or
State the factors responsible for high birth rate in Bangladesh?)
বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ফ্যাক্টরসমূহ ঃ
(i) বিবাহ বন্ধনে বিশ্বজনীনতা।
(ii) বাল্য বিবাহ
(iii) দারিদ্রতা,
(iv) নিম্নমানের জীবনযাত্রা,
(v) স্বল্প শিক্ষা,
(vi) পরিবার পরিকল্পনা গ্রহনের অনিচ্ছা।
(vii) ধর্ম- মুসলিম ধর্মের অনুসারীদের জন্মহার বেশি।
(viii) বহু বিবাহ।
(ix) ব্রেস্ট- ফিডিং।
(x) সামাজিকভাবে মহিলাদের অপ্রতিষ্ঠিত।

৭। প্রশ্ন ঃ মৃত্যুহার নিম্নগামী হবার কারণসমূহ কি কি?
(Qus. What are the causes of declining death rate?
মৃত্যুহার নিম্নগামী হবার কারণসমূহ ঃ
(i) প্রাকৃতিক দূর্যোগ নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন- দুর্ভিক্ষ, বড় ধরনের মহামারী রোগ।
(ii) চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে।
(iii) উন্নত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ-সুবিধা।
(iv) ন্যাশনাল হেল্‌থ প্রোগ্রামের উন্নতির প্রভাব।
(v) খাদ্য সরবরাহের উন্নতি সাধন।

(v) স্বাস্থ্য বিষয়ক ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন দিক নির্দেশনা।

(vi) ব্যাপকভাবে সংক্রামক রোগসমূহের নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন- কলেরা, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, স্মল পক্স ইত্যাদি।

8. Qus. What are the different processes of demography?

Demographic process :

Five demographic process.

1. Fertility- Fertility directly related with size of population.

2. Mortality :

Increase mortality- Decrease population

Decrease mortality- Increase population.

3. Marriage:

Early marriage - Increase population

Late marriage - Decrease population.

4. Migration:

Immigration- Increase population

Emigration - Decrease population.

5. Social mobility :

Changes in social status

Upgrade

Degrade

একাদশ অধ্যায়

৭। সংক্ষেপে লিখ ঃ

১। পরিবার পরিকল্পনা ১৩, ১৭

পরিবার পরিকল্পনা (Family Planing) ঃ

পরিকল্পনা অর্থ পূর্ব হতে চিন্তা করে সে মত কাজ করা। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিবেচনা করে যে পরিবার গঠন করা হয়, তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে। পরিবারের ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনার একটি বড় দিক হল কয়টি সন্তান হবে এবং কত সময়ের ব্যবধানে হবে তা আগে হতে স্থির করে নেয়া ও সেভাবে কাজ করা।

২। ডিহাইড্রেশন, ১৭

ডি-হাইড্রেশন ঃ

ডি-হাইড্রেশন হচ্ছে দেহের এমন একটি অবস্থা যেখানে টিস্যুর মধ্যস্থিত ইন্টারসেলুলার ও এক্সট্রাসেলুলার বডি ফ্লুইড স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়। অর্থাৎ দেহে তরল পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে হ্রাস পেলে, তাকে ডি-হাইড্রেশন বলে। যেমন- অতিরিক্ত বমি ও উদরাময় হলে দেহে পানি স্বল্পতা দেখা দেয়।

৩। W.H.O; ১৩, ১৭

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জাতিসংঘের একটি বিশেষ অরাজনৈতিক সংস্থা। (সানফ্রানসিসকোতে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার সম্মেলনে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে WHO এর জন্ম হয়)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে ইংরেজীতে WHO বলা হয়।

WHO means World Health Organization এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৭এপ্রিল ১৯৪৮ সালে। WHO এর সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ডে। WHO এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা দেশ ১৯৪টি। প্রতি বছর ৭ই এপ্রিল "বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস" পালিত হয়।

৪। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা; ১৬

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) ঃ

মানবদেহের টিস্যু বা অঙ্গ কোন জীবাণু বা টক্সিন দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে, সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ইমিউনিটি বলে। বা, মানবদেহের কোন সংক্রামকের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধকারী ক্ষমতা আছে, তাকে ইমিউনিটি বলে। ইমিউনিটির শ্রেণীবিভাগ (Types of Immunity) ঃ ইমিউনিটিকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ
(i) ইনেট বা কনজেনিটাল ইমিউনিটি (Innate immunity),
(ii) অর্জিত ইমিউনিটি (Acquired immunity)

৫। জলাতংক; ১৫, ১৬

জলাতংক ঃ

জলাতংক রোগ হচ্ছে র‍্যাবিস নামক এক প্রকার ভাইরাস হতে সৃষ্টি হয়। এই ভাইরাস সাধারণতঃ পাগলা কুকুরে লালাতে থাকে। কুকুরের দংশনের ফলে এই রোগ হতে পারে। জলাতংক রোগের সুপ্তিকাল ৪০ দিন। রোগাক্রান্ত কুকুরের দ্বারা দংশনের প্রায় ৪০ দিন পরে আক্রান্ত ব্যক্তি দেহে রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রোগী পানি দেখলে ভয় পায় ও চেহারায় আতংকভাব প্রকাশ পায়। রোগ বিস্তার- পাগলা কুকুরের লালায় র‍্যাবিস ভাইরাস থাকে। জীবাণু বাহী কুকুর সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করলে লালার সাথে উক্ত ভাইরাস দেহে প্রবেশ করে রোগের বিস্তার করে।

WHO means World Health Organization এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৭এপ্রিল ১৯৪৮ সালে। WHO এর সদর দপ্তর জেনেভা, সুইজারল্যান্ডে। WHO এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা দেশ ১৯৪টি। প্রতি বছর ৭ই এপ্রিল "বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস" পালিত হয়।

৪। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা; ১৬

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (Immunity) ঃ

মানবদেহের টিস্যু বা অঙ্গ কোন জীবাণু বা টক্সিন দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে, সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ইমিউনিটি বলে। বা, মানবদেহের কোন সংক্রামকের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধকারী ক্ষমতা আছে, তাকে ইমিউনিটি বলে। ইমিউনিটির শ্রেণীবিভাগ (Types of Immunity) ঃ ইমিউনিটিকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা ঃ
(i) ইনেট বা কনজেনিটাল ইমিউনিটি (Innate immunity),
(ii) অর্জিত ইমিউনিটি (Acquired immunity)

৫। জলাতংক; ১৫, ১৬

জলাতংক ঃ

জলাতংক রোগ হচ্ছে র‍্যাবিস নামক এক প্রকার ভাইরাস হতে সৃষ্টি হয়। এই ভাইরাস সাধারণতঃ পাগলা কুকুরের লালাতে থাকে। কুকুরের দংশনের ফলে এই রোগ হতে পারে। জলাতংক রোগের সুপ্তিকাল ৪০ দিন। রোগাক্রান্ত কুকুরের দ্বারা দংশনের প্রায় ৪০ দিন পরে আক্রান্ত ব্যক্তি দেহে রোগ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রোগী পানি দেখলে ভয় পায় ও চেহারায় আতংকভাব প্রকাশ পায়। রোগ বিস্তার- পাগলা কুকুরের লালায় র‍্যাবিস ভাইরাস থাকে। জীবাণু বাহী কুকুর সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করলে লালার সাথে উক্ত ভাইরাস দেহে প্রবেশ করে রোগের বিস্তার করে।

৬। লাইগেশন: ১৪, ১৬

লাইগেশন : মহিলাদের ফ্যালোপিয়ান টিউব কিছু অংশ ভাঁজ করে বেঁধে অপারেশন করাকে লাইগেশন বলে। পরিকল্পিত পরিবারের জন্য ইহা একটি স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি গ্রহণের মধ্যে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলনের আনন্দ ক্ষুন্ন হয় না।

৭। মাতৃমঙ্গল ১৫, ১৭

মাতৃমঙ্গলের গুরুত্ব : মাতৃমঙ্গলের উদ্দেশ্য হল গর্ভাবস্থা হতে প্রসবোত্তরকাল পর্যন্ত মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও যত্ন নেয়া। ইহা প্রসব প্রক্রিয়ায় মা ও শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে সহায়তা করে এবং প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দিয়ে থাকে। ইহা গর্ভাবস্থা, প্রসব ও প্রসবোত্তরকালীন স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে সমস্যাবলী দূরীকরণে চেষ্টা করে। সুতরাং মাতৃমঙ্গলের গুরুত্ব অপরিসীম।

৮। ভেসেকটমী ১৭

ভেসেকটমী : পুরুষের শুক্রবাহী নালী দুইটির কিছু অংশ ভাঁজ করে বেঁধে অপারেশন করাকে ভেসেকটমী বলে। পরিকল্পিত পরিবারের জন্য ইহা একটি স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি গ্রহণের মধ্যে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী যৌন মিলনের আনন্দ ক্ষুন্ন হয় না।

৯। নিরাপদ কাল। ১৬

নিরাপদকাল :

সন্তান উৎপাদনক্ষম স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাবের সময় ওভুলেশনের পিরিয়ড বাদ দিয়ে স্বামীসহবাস করে পরিকল্পিত পরিবার গঠন বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করাকে নিরাপদকাল বলে। ঋতুস্রাবের দিন থেকে গণনা শুরু করে ১০- ১৮ দিনের মধ্যে পর্যন্ত সময় ওভুলেশন হতে পারে। তাই এই সময় বাদ দিয়ে সহবাস করলে গর্ভধারণের ঝুঁকি থাকে না।

১০। খাবার স্যালাইন-১৫

খাবার স্যালাইনঃ

যে মিক্‌চার পান করলে দেহের পানিস্বল্পতা বা ডিহাইড্রেশন অবস্থা দূর হয়, তাকে রিহাইড্রেশন মিকচার বা খাবার স্যালাইন বলে। খাবার স্যালাইনের উপকরণসমূহ সস্তা ও সহজে পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে এবং ঘরেই তৈরি ও ব্যবহার করা যায়। প্রস্তুত করার পদ্ধতি সহজ। উদরাময়ের প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োগ করলে পানিস্বল্পতা প্রতিরোধ করা যায়। যেমন- অতিরিক্ত বমি ও উদরাময় হলে দেহে পানি স্বল্পতা দেখা দেয়।

১১। এন-জি-ও ১৫

এন.জি.ও ঃ এন.জি.ও হচ্ছে বেসরকারী সেবামূলক সংস্থা (Non Goverment Organisation)। ইহা সরকারের পাশাপাশি শহর ও গ্রামে শিক্ষা ও সেবামূলক বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহন করে। যেমন-

(i) স্বাস্থ্য সচেতনতা- সংক্রামক রোগের সচেতন করা।
(ii) বিশুদ্ধ পানি বা নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা।
(iii) বঞ্চিত শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা।
(iv) স্যানিটেশন ও স্যানিটারী ব্যবস্থা করা।
(v) ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে নিম্নআয়ের মানুষদের আত্মনির্ভর করা।
(vi) পরিকল্পিত পরিবার গড়ার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দান।

১২। আইসবার্গ- ফেনোমেনা ১৫

আইসবার্গ ফেনোমেনা অব ডিজিজ এর বর্ণনা ঃ

Iceberge শব্দটির অর্থ হল তুষার পর্বত আর Phenomena of Disease পানিতে ভাসমান একটি তুষার পর্বত যে সামান্য অংশ পানির উপর ভেসে থাকে এবং মানুষের নজরে পড়ে, তাকে বুঝানো

হয়েছে। তুষার পর্বতের বাকী বৃহৎ অংশটি মানুষের নজরে পড়ে না। মানুষের রোগকে পানিতে ভাসমান বরফের স্তুপ দৃশ্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মানুষের বহু রকম রোগের মধ্যে সকল রোগের সঙ্গে চিকিৎসকের পরিচয় ঘটে না। সীমিত সংখ্যক রোগ নিয়ে চিকিৎসা করে থাকেন। রোগের বৃহৎ অংশের সাথে পরিচয় না ঘটার কারণে উহার চিকিৎসা পদ্ধতি এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। মূলত আইসবার্গ ফেনোমেনা বলতে তাই বুঝানো হয়েছে।

১৩। ভাইরাস ১৫

ভাইরাস ঃ

ভাইরাস হলো প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক এসিড সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র, অকোষী, অতিআণুবীক্ষনিক জীব যা শুধুমাত্র উপযুক্ত পোষক দেহের ভিতরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং বিশেষ দেহে বিশেষ রোগ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু জীবকোষের বাইরে জড় পদার্থের মতো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করে। আবিষ্কার ঃ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রুশ জীবাণুবিদ আইভানোভসকি "মোজাইক" রোগাক্রান্ত তামাক পাতা হতে ভাইরাস আবিষ্কার করেন।

১৪। সদ্যজাত শিশুর খাদ্য, ১৪

সদ্যজাত শিশুর খাদ্য সম্পর্কে বর্ণনা ঃ

একটি শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। মাতৃদুগ্ধে শিশুর স্বাস্থ্য উপযোগী যে সকল উপাদান রয়েছে। তা অন্য কোন দুধে নাই। অর্থাৎ মায়ের দুধের বিকল্প নেই। নিম্নে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হল ঃ

(i) শিশু জন্মের ৩দিন পর্যন্ত মাতৃস্তনের দুধে কলেষ্টাম সমৃদ্ধ দুধ থাকে যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(ii) মায়ের দুধে প্রচুর পরিমাণে ইমিউনোগ্লোবিউলিন রয়েছে যা অন্য কোন দুধে প্রয়োজন করা সম্ভব নয়।

(iii) সব রকম ভিটামিন ও নানা রোগ প্রতিরোধক বস্তু শিশুর দেহে পরিপক্ক অবস্থায় প্রবেশ করে।

(iv) মাতৃদুগ্ধ দ্বারা শিশু সংক্রামিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

(v) মাতৃদুগ্ধ সঠিক তাপমাত্রায় থাকে যা শিশু সহজে হজম করে ও দেহের পুষ্টি সাধনে সাহায্য করে।

১৫। ভিটামিন, ০৯, ১৪

ভিটামিন (খাদ্যপ্রাণ) :

ল্যাটিন শব্দ থেকে ভিটামিন শব্দের উৎপত্তি। Vita অর্থ জীবন আর Amine অর্থ হল জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ যা দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি, বৃদ্ধি এবং অন্যান্য জৈবিক কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদনসহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অতি প্রয়োজনীয়। স্বল্প পরিমাণে খাদ্যে-উপস্থিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ হল ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। অর্থাৎ খাদ্যের মধ্যে এমন কতগুলি উপাদান আছে, যা অল্প পরিমাণে দেহের প্রয়োজন এবং দেহের গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগে কিন্তু এদের কোন ক্যালরী শক্তি নাই। খাদ্যের ঐ বিশেষ উপাদানগুলিকে ভিটামিন বলে।

১৬। কার্ডিয়াক ম্যাসেজ, ১৪

কার্ডিয়াক ম্যাসেজ :

কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট বা হৃদপিন্ডের গতিরোধ হলে যে প্রক্রিয়ায় রোগীকে সুস্থ্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়, তাকে কার্ডিয়াক ম্যাসেজ বলে। এনাসথেসিয়া, মেজর সার্জিক্যাল অপারেশন, ড্রাগ সেনসিটিভিটি, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, হার্ট ব্লক ইত্যাদি কারণে কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট হতে পারে। তখন তাড়াতাড়ি কার্ডিয়াক ম্যাসেজ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

১৭। রাতকানা রোগ, ১৪

রাতকানা ঃ

ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে চোখের দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়, তাকে রাতকানা রোগ বলে। ভিটামিন 'এ' এর উৎস- মাছ, মাছের তৈল, যকৃত, পনির, ডিমের কুসুম, কমলা, লাল শাক, আলু, ভুট্টা, পালংশাক, বাঁধাকপি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" পাওয়া যায়।

১৮। পাবলিক হেলথ; ১৩

পাবলিক হেলথ ঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় সমাজের সকলের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় জীবন-যাপনের জন্য বৃহত্তর স্বাস্থ্য রক্ষার পরিকল্পনা ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়সমূহ আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে পাবলিক হেল্থ বা জনস্বাস্থ্য বলে।

১৯। পানিবাহিত রোগ; ১৩

পানিবাহিত রোগ ঃ

যে সকল রোগের জীবাণু পানির মাধ্যমে মানুষের সুস্থ দেহে প্রবেশ করে এবং নানা রোগ সৃষ্টি করে। সে সকল রোগকে পানিবাহিত রোগ বলে। পানিবাহিত পাঁচটি রোগের নাম ঃ (i) ডায়রিয়া, (ii) ডিসেন্ট্রি, (iii) টাইফয়েড ও প্যারা টাইফয়েড, (iv) হেপাটাইটিস, (v) কলেরা।

২০। ভিটামিন "এ" ১৩

ভিটামিন "এ" এর উৎস ঃ

ভিটামিন "এ" চর্বিতে দ্রবনীয়। খাদ্যের সবুজ হলুদ রং এই ভিটামিনের বিশেষত্ব। মাছ, মাছের তৈল, যকৃত, পনির, ডিমের কুসুম,

কমলা, লাল শাক, আলু, মূলা, পালংশাক, বাঁধাকপি প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" পাওয়া যায়।

অভাবজনিত রোগ ঃ

ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। রোগ প্রতিরোধ শক্তি হ্রাস পায়। ফলে নানা রকম রোগ হয়। যেমন ঃ-
(i) রাত কানা। (ii) উদরাময়। (iii) চর্ম শুষ্ক ও খসখসে হওয়া। (iv) অস্থির অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। (v) প্রজনন ক্ষমতার হ্রাস। (vi) দন্তক্ষয়। (vii) শ্বাসতন্ত্রের রোগ প্রভৃতি।

২১। ই.পি.আই, ০৯

বাংলাদেশে EPI কার্যক্রম (Expanded programme of immunization) বা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে প্রত্যেক শিশুকে ৬টি সংক্রামক রোগের প্রতিরোধক টিকা প্রদানের জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তাকে সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচি বা EPI বলে। বাংলাদেশে EPI কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৯ সালের ৭ই এপ্রিল EPI এর আওতাধীন ৬টি টিকা হল ঃ (i) ডিপথেরিয়া, (ii) হুপিংকাশি, (iii) ধনুষ্টংকার, (iv) পোলিও, (v) যক্ষ্মা ও (vi) হাম রোগ এর B.C.G, D.P.T. পোলিও, হাম এবং টি, টি টিকা।

২২। টাইফয়েড, ০৯

টাইফয়েড ঃ

টাইফয়েড হচ্ছে একিউট সংক্রামক রোগ যা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাস সালমোনিলা টাইফি দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং কিছু নির্দেশক লক্ষণসমূহ দ্বারা প্রকাশিত হয়। যেমন- মাথাব্যথা, সব সময় উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত জ্বর, অস্থিরতা, ক্ষুধামন্দা, দুর্বলতা, ব্রাডিকার্ডিয়া, এবডোমিনাল অস্বস্থি, পর্যায়ক্রমে ডায়রিয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা, প্লীহা বৃদ্ধি

পায়। সুপ্তিকাল - ১০-১৪ দিন। সংক্রমণ পথ- পানি, দুধ, খাদ্য এবং মাছি এর মাধ্যমে ছড়ায়।

২৩। মহামারী রোগ ০৮

মহামারী রোগ (Epidemic) ঃ

কোন সংক্রামক রোগ কোন এলাকায় অল্প সময়ে বহু লোককে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত করে, তাকে মহামারী রোগ বলে। এই রোগ হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ইহা বিনা চিকিৎসায় নির্দিষ্ট সময়ে পরে সেরে যায় বা রোগীর মৃত্যু ঘটায়। সাধারণতঃ স্থানীয় পানি ও মৃত্তিকার দোষে দূষিত বায়ুর প্রভাবে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, প্লাবন প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

২৪। ইকোলজি। ০৮

ইকোলজি (Ecology) ঃ

জীব ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক বিজ্ঞানকে ইকোলজি বলে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে ইকোলজি দ্বারা বুঝানো হয় যে, মানুষ যে পরিবেশে বসবাস করে সে পরিবেশের প্রভাব তাঁর শরীর ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রতিকুল প্রভাব মানুষের শরীর ও মনের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়।

২৫। অযৌন প্রজনন, ০৮

অযৌন প্রজনন ঃ

দুইটি জননকোষ অর্থাৎ গ্যামটের মিলন ছাড়া বিভিন্ন ধরনের স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে যে জনন কার্য সম্পাদিত হয়, তাকে অযৌন প্রজনন বলে। সাধারণতঃ স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমেই ইহা অযৌন প্রজনন কার্য সম্পন্ন করে। বৃদ্ধির প্রথম দিকে অনুকূল পরিবেশে যখন পোষক বস্তুতে প্রচুর খাদ্য থাকে তখন স্পোর দ্বারা এই প্রজনন সম্পন্ন হয়।

ফাস্ট এইড

১। প্রশ্ন ঃ ফাস্ট এইড কি ? ইহার গুরুত্ব লিখ।
বা, ফাস্ট এইড বলতে কি বুঝ ? ইহার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
বা, ফাস্ট এইড কি ? জনজীবনের ইহার গুরুত্ব লিখ।

ফাস্ট এইড ঃ

যে কোন মুহূর্তে মানুষ দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবার পূর্বে প্রাথমিক অবস্থায় রোগীকে যে চিকিৎসা দেয়া হয় বা রোগীর জন্য যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাকে ফাস্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। ইহা দ্বারা রোগীকে প্রচন্ড ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

ফাস্ট এইড এর গুরুত্ব ঃ

যে কোন জায়গায় ও কর্মস্থলে হঠাৎ সামান্য বা মারাত্মক যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এসব আকস্মিক বিপদে চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত রোগীকে ব্যবস্থাপনা দিয়ে তাঁর সঙ্কটাবস্থা দূর করা অত্যন্ত জরুরী। চিকিৎকের শরণাপন্ন হবার পূর্বে প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে অনেক সময় রোগী মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং প্রাথমিক চিকিৎসার জ্ঞান থাকা এবং যেকোন ধরনের দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

২। প্রশ্ন ঃ প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত পাঁচটি ঔষধের লক্ষণভিত্তিক আলোচনা কর। ০৮

ফাস্ট এইডে ব্যবহৃত পাঁচটি ঔষধের লক্ষণাবলী লিখ। ১৫

প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত পাঁচটি ঔষধের লক্ষণভিত্তিক আলোচনা ঃ

(ক) একোনাইটাম নেপেলাসের লক্ষণাবলী ঃ

(i) চোখ লাল, প্রদাহিত, শুষ্ক এবং উত্তপ্ত বলে মনে হয়, যেন ভিতরে বালি রয়েছে।

(ii) সর্দি - প্রচুর হাঁচি, নাকের মধ্যে দপ্‌দপানি, উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব, শ্লৈষ্মিকঝিল্লী শুষ্ক, নাক বন্ধ, শুষ্ক বা নাক হতে সামান্য পানির মত সর্দি বাহির হয়।

(iii) মুখমন্ডল রক্তবর্ণ, উত্তপ্ত, স্ফীত। এক ধারের গন্ডদেশ লাল, অপরদিকে গন্ডদেশ মলিন। উঠে বসলে লাল মুখ মৃত্যুসূচক মলিনতা প্রাপ্ত হয় বা রোগীর মাথা ঘুরতে থাকে।

(iv) পিত্ত, শ্লেষ্মা, রক্তযুক্ত হালকা সবুজ বমি। পেটের মধ্যে চাপবোধ তৎসহ শ্বাসকষ্ট। রক্তবমি, পাকস্থলী হতে অন্ননলী পর্যন্ত জ্বালা।

(v) তলপেট উত্তপ্ত, টানযুক্ত, ফাঁপা, স্পর্শ অসহিষ্ণুতা, শূলব্যথা কোন অবস্থাতেই উপশম হয় না। নাভিদেশে জ্বালা।

(খ) আর্নিকা মন্টেনার ব্যবহার ঃ

(i) আঘাতের কুফল, যদিও বহুদিন পূর্বে ঘটে থাকে।

(ii) পতনজনিত বা যান্ত্রিক কারণে থেঁৎলান ব্যথা, টাটানি বোধ, রক্তপাত, শোনিত ধারা নির্গমন ও নাসিকা থেকে রক্তস্রাব।

(iii) আঘাতজনিত আচ্ছন্ন ভাব। মস্তিষ্কে আঘাতজনিত অবসাদ এবং মস্তিষ্কবিল্লি প্রদাহ।

(iv) আঘাত বা অত্যধিক পরিশ্রমজনিত হৃদপিন্ড বিবর্ধন।

(v) আঘাতের পর মূত্রাবরোধ বা প্রসবের পর অনবরত ফোঁটা ফোঁটা মূত্র।

(vi) ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত বা পতনের কারণে থেঁৎলান ব্যথা।

(vii) রোগীর সমস্ত শরীরে অত্যধিক ব্যথা, নরম গদি আঁটা বিছানা ও তার কাছে অত্যন্ত শক্ত মনে হয়।

(viii) প্রদাহ ও আঘাতাদির ফলে শরীরের উপরিভাগ গরম এবং নিম্ন ভাগ ঠান্ডা বোধ হয়।

(ix) আঘাতের কারণে যে কোন প্রকার রোগ হলে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ।
(x) আঘাত লেগে কালশিরা পড়লেও আরোগ্য হয়। (লিডাম) এবং কোন দুঃখ শোক ও অর্থ ক্ষতিজনিত অসুস্থতা।
(xi) পেশীর দূর্বলতা, তাই ঘাড় সোজা করে রাখতে পারে না, আঘাত জনিত আড়ষ্টতা।

(গ) ক্যান্থারিস ঃ

(i) ফোস্কা জাতীয়, তৎসহ অত্যধিক অস্থিরতা।

(ii) উদ্ভেদ, তৎসহ শষ্যের গুড়ার মত আঁশ।

(iii) রঙ পরিবর্তনশীল উদ্ভেদ তার সঙ্গে জ্বালা ও চুলকানি।

(iv) প্রখর সূর্য কিরণে ঝলসায়ে যাওয়া, মুখমন্ডল উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ।

(v) দগ্ধাবস্থা, ছ্যাঁকা লাগার অবস্থায়, ছনছনে ব্যথা ও জ্বালা।

(vi) ঠান্ডা প্রয়োগে উপশম, তারপর অত্যধিক প্রদাহের সূচনা হয়।

(vii) আগুনে পুড়ে গেলে ক্যান্থারিস অতি চমৎকার ঔষধ।

(viii) কোন কোন স্থান পুড়ে গেলে যদি তৎক্ষনাত ক্যান্থারিস বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা হয়, তবে চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

(ix) ফোস্কা পড়ার পূর্বে প্রয়োগ করলে আর ফোস্কা উঠে না এবং ফোস্কা পড়ার পর প্রয়োগ করলে জ্বালা ও ব্যথা অতি দ্রুত কমে যায়।

(ঘ) হাইপেরিকাম ঃ

(i) ইহা স্নায়ুসমূহের আঘাতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ- বিশেষ করে হাতের ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং নখের স্নায়ুসমূহের আঘাতের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।

(ii)আঙ্গুলের অগ্রভাগ পিষে যাওয়া কারণে তীব্র ব্যথা।

(iii) অস্ত্রোপচারের পরে ব্যবহার যন্ত্রণার উপশম।

(i) মেরুদণ্ডের আঘাত- পড়ে যাবার ফলে সেক্রামে ব্যথা, ব্যথা মেরুদণ্ড বরাবর উপরে উঠে এবং নীচের দিকে পা পর্যন্ত নামে।

(ii) মস্তিষ্কে শূন্যতার অনুভূতি ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা।

(iii) মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলএবং টেনে ধরার, ছিঁড়ে ফেলার মত দাঁতের ব্যথাসহ বিষণ্ণতা।

(iv) জিহ্বার উপর সাদা প্রলেপ, অগ্রভাগ পরিষ্কার।

(৪) লিডাম পল ঃ

(i) ভ্রমনকালে মাথাঘোরা আরম্ভ হয়, তৎসহ একদিকে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা।

(ii) চোখে কনকনানি, ছানি তার সাথে সন্ধিবাত। চোখে আঘাতজনিত রক্তশিরা।

(iii) গলদেশে লাল লাল ফুস্কুড়িসমূহ স্পর্শ করলে হুল ফোটানবৎ ব্যথা।

(iv) রোগী সর্বদাই শরীর ঠান্ডা ও শীতল অনুভব করে, শরীরের তাপের অভাব পায়, আক্রান্ত অংশ স্পর্শে ঠান্ডা বোধ হয়, শয্যার তাপ সহ্য হয় না।

(v) বাত বা গেটে বাত নিম্ন দিক হতে আরম্ভ করে ক্রমশঃ উপরের দিকে পরিচালিত হয়। (নিচের দিকে নামে ক্যালমিয়া)।

(vi) শরীরের বাম শোল্ডার এবং ডান হিপজয়েন্ট আক্রান্ত হয়।

(vii) মুখে ও কপালে লাল বর্ণের ব্রণ, হাত দিলে হুল ফোটার মত ব্যথা।

(viii) নাক হতে রক্তস্রাব, নাকের মধ্যে জ্বালা (মেলিলোটাস ও ব্রাইনিয়ার)

(ix) কাশি রক্তময় শ্লেষ্মা ও ছাতাপড়ার ন্যায় দূর্গন্ধি, স্বাদ, শ্বাস কৃচ্ছ্রতা, শ্বাসনালীর মধ্যে ব্যথা।

(x) বুকের মধ্যে সংকোচন অনুভূতি ও দম বন্ধ হবার ন্যায় অবস্থা।

(xi) শ্বাসনালীর উপরের ভাগে সুড়সুড়ি, আক্ষেপিক কাশি, ফুসফুস হতে রক্তস্রাব ও বাত রোগে পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়।

(xii) বিষাক্ত জীব-জন্তুর কামড়ের পরে লিডাম প্রয়োগে নির্দেশিত হয়, যদি প্রদাহযুক্ত স্থান ঠাণ্ডায় উপশম হয়। ইঁদুর, বোলতা, ভিমরুল, প্রভৃতির দংশনের কুফল।

(xiii) ঘুষি বা আঘাতাদির পর ঐ স্থানে কালশিরা পড়লে লিডাম সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। বহুকাল পূর্বে আঘাত পাওয়ার পর যদি ঐ স্থানে বর্ণ বিকৃত বা কালশিরা সবুজবর্ণের হয়ে যায় ইহা ব্যবহারে আরোগ্য হয়।

(xiv) কোন স্থানে কাটা, খোঁচা, সূচ, পেরেক বা পশুনি ফুটে আহত হলে, স্নায়ুতে আঘাত (হাইপেরিকাম)।

(চ) ক্যালেন্ডুলা-অফিসিন্যালিস ঃ

ইহার অপর নাম মেরিগোল্ড বা গাঁদা। প্রায় সকল প্রকার ক্ষতেই ব্যবহৃত হয়। ক্যালেন্ডুলাকে হোমিওপ্যাথিক অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ বলা হয়। হঠাৎ কোন স্থান কেটে গেলে বা ছিঁড়ে গেলে ইহা লাগিয়ে বেঁধে দিলে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত পড়া এবং পুঁজোৎপত্তি বন্ধ হয়। ক্যালেন্ডুলার ক্ষতাদি আরোগ্য করার ক্ষমতা অসীম। ক্যালেন্ডুলার লোশন ও মলম গ্যাংগ্রীনযুক্ত ক্ষতে ব্যবহারে বিশেষ ফল হয়। চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে সেস্থান হতে রক্তস্রাব হতে থাকলে বা ক্ষত হলে ঐ স্থানে পুঁজ জন্মিলে ইহা ব্যবহারে ফলপদ।

১। প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম উল্লেখ কর।

বাংলাদেশে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রম ঃ

(i) বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার।

(ii) পারিবারিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পরিবার পরিকল্পনা।

(iii) প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য এর উন্নয়ন। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণ, ই.পি.আই টিকা দান কর্মসূচী।

(iv) খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ।

(v) স্বাস্থ্যপত্র ও তথ্য প্রকাশ।

(vi) ডেমোগ্রাফি বা জনমিতি।

(vii) অন্যান্য স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সহযোগীতা করা ইত্যাদি।

(viii) রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও ইউনিসেফসহ বিভিন্ন সেবা সংস্থার মাধ্যমে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

মূলতঃ WHO এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা।

২। প্রশ্ন ঃ আবর্জনা কি ? শহরে আবর্জনা নিষ্পত্তিকরণের পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা দাও।

আবর্জনা ঃ

যে সকল দ্রব্যাদি স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে, রোগ সংক্রামণে সহায়তা করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে ইত্যাদিসহ সকল প্রকার পরিত্যাক্ত নোংরা ও অনাবশ্যক জিনিষকে আবর্জনা বলা হয়। অর্থাৎ যে সকল বস্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং সংক্রমণে সহায়তা করে, তাকে আবর্জনা বলে।

শহরে আবর্জনা নিস্পত্তিকরণের পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা ঃ

শহরে আবর্জনা নিস্পত্তিকরণের পদ্ধতিগুলোর নিম্নরূপ ঃ

(i) ড্রেনেজ পদ্ধতি ঃ শহরাঞ্চলে অনেক লোকে বাস, এখানে প্রতিদিন প্রত্যক মানুষের জন্য খাদ্য ও বাসস্থান প্রস্তুত জন্য অনেক আবর্জনা তৈরি হয়। এর মধ্যে তরল আবর্জনা নিস্পত্তিকরণের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা করে রান্নাঘর ও গোসল খানার এবং শিল্পকারখানার বর্জ্য অপসারন করা যায়।

(ii) ভরাট কাজে লাগিয়ে নিস্পত্তিকরণ ঃ শহরাঞ্চলে অনেক লোকে বাস, এখানে প্রতিদিন প্রত্যক মানুষের জন্য খাদ্য প্রস্তুতের জন্য এবং মানুষের উন্নত জীবনযাপনের জন্য উৎপন্ন আবর্জনা ডোবা-নালায় ফেলে ভরাট করে এটি নিস্পত্তিকরণ করা যায়।

(iii) আবর্জনা পুড়িয়ে নিস্পত্তিকরণ ঃ শহরের আবর্জনা সংগ্রহ করে একটি চুল্লির ভিতর দিয়ে পুড়ে ফেলে এটি নিস্পত্তিকরন করা যায়।

(iv) কম্পোর্ষ্টিং পদ্ধতিতে নিস্পত্তিকরণ ঃ শহরাঞ্চলে আবর্জনা নিস্পত্তিকরণের জন্য শহর হতে কিছুটা দূরে সারি করে কতগুলি গর্ত খনন করা হয়। গর্তের আকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ৬ ফুট ও গভীরতা ২ ফুট। প্রথমে ৬ ইঞ্চি পুরু করে আবর্জনা গর্তে ফেলা হয়। পরে সমপরিমাণ তরল আবর্জনা এটি উপর দেয়া হয়। আবার আবর্জনা ও তরল আবর্জনা পর্যায়ক্রমে ফেলে গর্তগুলি পূর্ণ করা হয়। প্রথম ১৪ দিনের মধ্যে দুইবার লোহার হাতল দিয়ে আবর্জনা মিশ্রিত করতে হবে। আবর্জনা সম্পূর্ণ পচনের ফলে জৈব সারে পরিণত হবে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে শহরাঞ্চলের আবর্জনা নিস্পত্তিকরণ করা যেতে পারে।

৩। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন 'এ' এর কাজ, দৈনিক চাহিদা, অভাবজনিত রোগ এবং আধিক্যজনিত রোগের নাম লিখ।

ভিটামিন 'এ' এর কাজ ঃ

(i) এটি চোখের দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি করে।

(ii) এটি শ্বাসনালী ও পরিপাকতন্ত্রের ইপিথেলিয়াম কোষ গঠনের জন্য প্রয়োজন হয়।

(iii) এটি দেহে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ভিটামিন 'এ' এর দৈনিক চাহিদা ঃ

(i) প্রপ্তবয়স্ক - ৫০০০-৬০০০ iu/day

(ii) গর্ভবতীদের- ৭০০০-৮০০০ iu/day

(iii) শিশুদের- ৬০০০-৭০০০ iu/day

ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত রোগ ঃ

(i) রাতকানা রোগ, (ii) শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ ও ক্ষত, (iii) ত্বক রুক্ষতা, (iv) শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়, (v) কিডনীর পাথর সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'এ' আধিক্য জনিত রোগ ঃ

(i) চুল উঠে যাওয়া, (ii) দেহের ওজন কমে যাওয়া, (iii) খাওয়ার অরুচি, (iv) বমি বমি ভাব, (v) দেহের লম্বা অস্থিসমূহে ব্যথা ও ফোলা।

৪। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন 'ডি' কাজ, অভাবজনিত ক্ষতিকর প্রভাব লিখ।

ভিটামিন 'ডি' এর কাজ ঃ

(i) ইনটেস্টাইন (অন্ত্র) থেকে ক্যালসিয়াম শোষন সংবর্ধিত করে।

(ii) নতুন হাড় গঠনে ক্যালসিয়াম জমা করতে সাহায্য করে।

(iii) দেহের কঙ্কালতন্ত্রে সঠিক আকৃতি প্রদানে সাহায্য করে।

ভিটামিন 'ডি' এর অভাবজনিত ক্ষতিকর প্রভাব ঃ

(i) শিশুদের রিকেটস রোগ, (ii) প্রাপ্ত বয়স্কদের হাড়ের ভঙ্গুরতা (অষ্টিওম্যালেসিয়া), (iii) বমি বমিভাব ও বমি করা, (iv) পিপাশা বৃদ্ধি পায়। (v) ঝিমানো ভাব, (vi) রেনাল ফেলিউর- প্রস্রাব বেশি হওয়া এবং প্রস্রাবে প্রোটিন পরিমাণ বেশি থাকে।

৫। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন 'ই' এর উৎস ও কাজ লিখ।

ভিটামিন 'ই' এর কাজ ঃ

(i) বন্ধ্যাত্ব রোধ করে। (ii) মাংসপেশির সাধারণ কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রয়ণ করে। (iii) গর্ভাবস্থায় ফিটাসের বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ করে। (iv) এটি দেহে এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে।

ভিটামিন 'ই' এর উৎস ঃ প্রাণিজ উৎস ঃ ডিম, মাংস, কলিজা, মাছ, দুধ, মুরগী। **উদ্ভিদ উৎস ঃ** সয়াবিন, বিভিন্ন বীজের তৈল, ভেজিটেবলস ইত্যাদি। প্রতিদিন প্রয়োজন- ১৫-২০ IU/day

ভিটামিন 'ডি' এর অভাবজনিত রোগ ঃ বন্ধ্যাত্ব, হেবিসুয়াল এবরশন, মাংসপেশির অসাড়তা, অন্ডকোষের অসড়তা, দৈহিক বৃদ্ধি ব্যহত হওয়া ইত্যাদি।

৬। সংক্ষেপে লিখ ঃ আজল ২০২০

আজল ঃ স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় স্ত্রীর যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত করানোকে আজল বলা হয়।। এটির উদ্দেশ্য স্ত্রীকে গর্ভধারণ থেকে বিরত রাখা। শারীরিক অসুস্থতা অথবা দুই সন্তানের মাঝে প্রয়োজনীয় ব্যবধান রাখার ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রয়ণে আজল করা হয়। এটি একটি জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কৌশল মাত্র। এটির মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিবার গঠন করা সম্ভব। দারিদ্রতা, অধিক সন্তান এবং দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এটি বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৭। প্রশ্ন ঃ রাতকানা রোগ কি ? বর্ণনা কর।

রাতকানা রোগ ঃ

রাতকানা একটি ভিটামিন 'এ' এর অভাব জনিত রোগ। এ রোগে রোগী রাতের বেলায় চোখে দেখতে পায়। যে সকল খাদ্যে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। যেমন- মাছ, মাছের তৈল, যকৃত, পনির, ডিমের কুসুম, কমলা, লাল শাক, আলু, ভুট্টা, পালংশাক, বাঁধাকপি প্রভৃতি গ্রহণে এ রোগ থেকে নিরাময় পাওয়া যায়।

৮। প্রশ্ন ঃ ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স এর বর্ণনা দাও।

ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ঃ

ভিটামিন বি$_১$ (থায়ামিন), ভিটামিন বি$_২$ (রিবোফ্লাবিন), ভিটামিন বি$_৩$ (নিকোটিনিক এসিড বা নিয়াসিন), ভিটামিন বি$_৫$ (প্যানটোথেনিক এসিড), ভিটামিন বি$_৬$ (পাইরিডক্সিন), ভিটামিন$_{১২}$ (সাইনোকোবালামিন), ভিটামিন এইচ (বায়োটিন) ও ভিটামিন এম (ফলিক এসিড)।

ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) ঃ কাজ ঃ পরিপাক এবং ক্ষুধা তৈরি করে। স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্যাবলিতে এটি ব্যবহৃত হয়। কো-এনজাইমের মত কাজ করে। শর্করা বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) এর দৈনিক চাহিদা- গড়ে ১.২-১.৫ মিলিগ্রাম।

ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) এর উৎস ঃ উদ্ভিদ উৎস- ঢেকিচাটা চাউল, ভুট্টা, আটা, বীন, পীচ, শাক-সব্জি, ফল, বাদাম ইত্যাদি।
প্রাণিজ উৎস- দুধ, মাংস, মাছ, ডিমের কুসুম ইত্যাদিতে খুব সামান্য পরিমাণ ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) থাকে।
ভিটামিন বি১ (থায়ামিন) এর অভাবজনিত রোগ ঃ বেরি বেরি, ক্ষুধামন্দা, স্টার্চ ও চিনির পরিপাক গোলযোগ। ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদপিন্ডের অস্বাভাবিক কার্যকারীতা।

ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লাবিন) ঃ কাজ ঃ দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি জন্য এটি প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখে। কার্বহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন মেটাবলিজমে সহায়তা করে। টিস্যুতে অক্সিডেশন এবং রেসপিরেশনে কো-এনজাইম হিসাবে কাজ করে। দৈনিক প্রয়োজন- পুরুষের-১.৬ মিলিগ্রাম, মহিলাদের- ১.৪ গ্রাম।

ভিটামিন বি২ (রিবোফ্লাবিন) এর উৎস ঃ প্রাণিজ- দুধ, মাংস, ডিমের কুসুম, লিভার। উদ্ভিদ উৎস- খোসাসহ আটা, জব, সবুজ শাকসব্জি, মাসরুম ইত্যাদি। অভাবজনিত রোগ- এঙ্গুলার স্টোমাটাইটিস, গ্লোসাইটিস, রক্তাল্পতা, ত্বক ফাটা, অস্পষ্ট দৃষ্টি ইত্যাদি।

ভিটামিন বি$_{৩}$ (নিকোটিনিক এসিড বা নিয়াসিন) ঃ কাজ ঃ দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। ত্বকের মসৃণতার রক্ষা করে। প্রতিদিন প্রয়োজন- ১৪-২০ মিলিগ্রাম। প্রাণিজ উৎস- দুধ, মাংস, মাছ, কলিজা, ডিমের কুসুম ইত্যাদি। উদ্ভিদ উৎস- ভুট্টা, খোসাসহ আটা, ইস্ট কফি, পীচ, শাক-সব্জি, টমেটো, বাদাম ইত্যাদি।

অভাবজনিত রোগ ঃ স্টোমাটাইটিস (মুখের ক্ষত), গ্লোসাইটিস (জিহ্বায় ক্ষত), মানসিক অবসন্নতা।

ভিটামিন বি$_{৫}$ (প্যানটোথেনিক এসিড) ঃ কাজ ঃ কার্বহাইড্রেট মেটাবলিজমে সহায়তা করে। কোলেস্টেরল ও ফ্যাট এসিড সংশ্লেষণ সহায়তা করে। দৈনিক প্রয়োজন- গড়ে ১০ মিলিগ্রাম/দিন। উৎস ঃ প্রালিজ উৎস- ডিমের কুসুম, দুধ, লিভার। উদ্ভিদ উৎস- পীচ, ইস্ট, মিষ্টি আলু।

ভিটামিন বি$_{৫}$ (প্যানটোথেনিক এসিড) অভাবজনিত ঃ অকাল চুল পাকা, ত্বকের প্রদাহ, দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

ভিটামিন বি$_6$ (পাইরিডক্সসিন) ঃ কাজ ঃ এমাইনো এসিডের আন্তঃরূপান্তর ঘটায়। কার্বহাইড্রেট ও ফ্যাট মেটাবলিজমে সহায়তা করে। দৈনিক চাহিদা - গড়ে- ২ মিলিগ্রাম/দিন।
ভিটামিন বি$_6$ (পাইরিডক্সসিন) এর উৎস ঃ প্রাণিজ উৎস – দুধ, মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম ইত্যাদি। উদ্ভিদ উৎস- শাক-সব্জি, আটা।
ভিটামিন বি$_6$ (পাইরিডক্সসিন) অভাবজনিত রোগ- চর্মরোগ, কনভালশন (খিঁচুনি), নিউরাইটিস (স্নায়ু প্রদাহ)।

ভিটামিন$_{১২}$ (সাইনোকোবালামিন) ঃ কাজ ঃ লোহিত রক্ত কণিকাকে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করে। ডি.এন.এ সিনথেসিসে সহায়তা করে।
দৈনিক চাহিদা- ২ মাইক্রোগ্রাম/ দিন।
উৎস- কলিজা, মাছ, ইস্ট, ডিমের কুসুম।
ভিটামিন$_{১২}$ (সাইনোকোবালামিন) অভাবজনিত রোগ ঃ মেগালোব্লাস্টিক এনিমিয়া, পেরিপেরাল নিউরোপ্যাথি।

ভিটামিন এইচ (বায়োটিন) ঃ কাজ ঃ দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। লিপিড সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। উৎস ঃ ইস্ট, ডিম, কলিজা, ইক্ষু, পীচস, মাংস, শাকসব্জি এবং তাজা ফল। ভিটামিন এইচ (বায়োটিন) অভাবজনিত রোগ ঃ ডার্মাটাইটিস, মাসকুলার পেইন।

ভিটামিন এম (ফলিক এসিড) ঃ কাজ ঃ লোহিত রক্ত কণিকা পরিপূর্ণতা লাভে সহায়তা করে। নিউক্লিক এসিড গঠনে সহায়তা করে। দৈনিক চাহিদা- ১০০ মাইক্রোগ্রাম/দিন। প্রাণিজ উৎস ঃ লিভার, কিডনী, ডিম, মাংস, দুধ। উদ্ভিদ উৎস- কমলা লেবু, তরমুজ, পটেটো, ইস্ট, বীনস, সয়াবিন, পীচস, শাকসব্জি ইত্যাদি।
ভিটামিন এম (ফলিক এসিড) অভাবজনিত রোগ ঃ মেগালোব্লাস্টিক এনিমিয়া, গ্লোসাইটিস, ঠোঁটের মধ্যে ক্ষত, পরিপাকতন্ত্রের রোগ।

৯। প্রশ্ন ঃ প্রাথমিক চিকিৎসার সময় কি কি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে ?

প্রাথমিক চিকিৎসার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে ঃ

(i) রোগীকে যতদূর সম্ভব ভীড়মুক্ত স্থানে রাখা এবং প্রয়োজনীয় আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ii) শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া যাতে স্বাভাবিক থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(iii) আহত ব্যক্তির যদি রক্তস্রাব থাকে, তবে দ্রুত রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।

(iv) আহত ব্যক্তির শরীরের পোশাক খোলার প্রয়োজন হলে এমনভাবে খুলতে হবে যাতে রোগী কষ্ট না পায়। দরকার হলে সেলাই খুলে কাঁচি দিয়ে কেটে পোষাক খুলতে হবে।

(v) রোগীর আক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন অবলম্বনের সাহায্যে বেঁধে রাখতে হবে।

(vi) আঘাতের পর রোগীর দেহের তাপমাত্রা যাতে স্বাভাবিকের চেয়ে কমে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(vii) এন্টিসেপ্টিক লোশন দিয়ে ক্ষত স্থান দ্রুত পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করতে হবে।

(viii) রোগী যেভাবে থাকলে আরাম বোধ করে, সেভাবে রাখতে হবে।

১০। প্রশ্ন ঃ ক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা লিখ।

ক্ষতের চিকিৎসা ঃ

(i) আক্রান্ত অংশে সাবধানতার সঙ্গে নড়াচড়া করতে হবে যাতে আরও বেশি ইনজুরি না হয়।

(ii) রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে।

(iii) ব্যথা দূর করার জন্য লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) শক থাকলে তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

(v) টিটেনাস ও গ্যাস গ্যাংরিনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক ব্যবস্থা করতে হবে।

(vi) স্থানীয় চিকিৎসা ঃ

(ক) আক্রান্ত হবার সাথে সাথে প্রতিরক্ষামূলক জীবাণুমুক্ত ড্রেসিং করতে হবে।

(খ) ক্ষতের পাশের ত্বক পরিষ্কার ও সেভ করতে হবে।

(গ) প্রয়োজনে লোকাল বা জেনারেল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে ক্ষত জীবাণুমুক্ত স্যালাইন দ্বারা ড্রেসিং করতে হবে এবং ভিতরে যদি কোন ফরেন বডি থাকলে তা বাহির করে ফেলতে হবে।

(ঘ) মুখ এবং হাতের ক্ষত ছাড়া অন্যান্য ক্ষতের কিনার ৩ মি.মি. কেটে ফেলতে হবে। নষ্ট হয়ে যাওয়া ফ্যাট, ফ্যাসা এবং মাংসপেশী ফেলে দিতে হবে কিন্তু ব্লাড ভেসেল এবং নার্ভ সর্তকতার সঙ্গে রক্ষা করতে হবে। অস্থির খন্ডিত অংশ পুনঃস্থাপন ও মেরামত করতে হবে।

(ঙ) ক্ষত সৃষ্টির প্রথম ৮ ঘন্টার মধ্যে রোগী আসলে সেলাই করে ক্ষতের কিনারগুলি একত্রে জোড়া লাগাতে হবে। একে প্রাইমারী সুচার বলে। ৮ ঘন্টার পরে হলে এবং যদি দূষিত থাকে, বা বেশি টিস্যু নষ্ট হয় তবে সেলাই দিতে ৫/৬ দিন দেরী করতে হবে। একে ডিলেড্ প্রাইমারী সুচার বলে। যে সকল ক্ষেত্রে ত্বক একত্রে লাগানো সম্ভব হয় না, সে সকল ক্ষেত্রে স্কীন গ্রাফটিং করতে হবে।

১১। প্রশ্ন ঃ পোড়া ক্ষতের ব্যবস্থাপনা লিখ।

পোড়া ক্ষতের ব্যবস্থাপনা ঃ

(ক) স্থানীয় চিকিৎসা ঃ জীবাণু সংক্রমণ বন্ধ করা ও ক্ষত দ্রুত আরোগ্যের বা শুকানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১। ১ম ডিগ্রী বার্নের কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নাই।

২। সামান্য ২য় ডিগ্রী বার্ন জীবাণুমুক্ত পানি ধারা ধৌত করা যেতে পারে। বড় বড় ফোস্কাগুলি জীবাণু নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফুটা করে দিতে হবে। কিন্তু পোড়া ত্বক সরিয়ে ফেলা যাবে না। এই মৃত ত্বক এবং শুকনো একজুডেট (exudate) একটি স্তর তৈরী করে আক্রান্ত এলাকাকে জীবাণু সংক্রমণের হাত হতে রক্ষা করে। আংশিক বার্নের ক্ষেত্রে এই স্তরের নীচ হতে ক্ষত শুকানো শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে কিনারা হতে এই স্তর চটা ধরে উঠে যায়।

(খ) সাধারণ চিকিৎসা ঃ শক মোকাবিলা এবং পুষ্টি সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

(গ) মারাত্মক বার্নের ক্ষেত্রে জীবাণুমুক্ত পানি দ্বারা ক্ষত ধৌত করতে হবে। তৈলাক্ত কিছু ক্ষতে লাগানো থাকলে এটি বেনজিন দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। শুধুমাত্র আলগা এবং মরা টিস্যু ফেলে দিতে হবে। ফোস্কাগুলি জীবাণু নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ফুটা করে যথা স্থানে রেখে দিতে হবে যাতে এরা রক্ষাকারী স্তর হিসাবে কাজ করে। এটির পর এন্টিব্যাকটেরিয়াল ঔষধ প্রয়োগ করে গজ, তুলা দ্বারা ক্ষত আবৃত করে ব্যান্ডেজ করে দিতে হবে। ৩য় দিনে ড্রেসিং করে ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করে দিতে হবে। এভাবে ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ড্রেসিং করতে হবে।

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) ঃ

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাব প্রথমে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান নগরীতে শনাক্ত করা হয়। এর বিশ্বব্যাপী প্রাদুর্ভাব ও দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এটি বিশ্বের অন্তত ২১৩টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ তালিকায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে। ২০২০ সালের ১১ই মার্চ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটিকে একটি বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটি আনুষ্ঠানিক নাম কোভিড-১৯ দেয়, যা 'করোনাভাইরাস ডিজিজ-২০১৯'- এর সংক্ষিপ্ত রূপ। শুরুর দিকের উপসর্গ সাধারণ সর্দিজ্বর এবং ফ্লু'য়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় রোগ নির্ণয়ে ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। করোনা ভাইরাস বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি আছে, তারমধ্যে ৭টি প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। করোনানা ভাইরাস একটি ভাইরাসঘটিত একটি সংক্রামক রোগ। বিজ্ঞানীদের ধারণ এর মধ্যে এই ভাইরাস মানুষের দেহকোষের রূপ পরিবর্তন করছে। এটি ফুসফুসের সংক্রমিত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ধারণা এটির উৎস- কোন প্রাণী থেকে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণাবলী ঃ

(i) জ্বর, (ii) অবসাদ, (iii) শুষ্ক কাশি,

(iv) বমি বমিভাব ও বমি হওয়া।

এক সপ্তাহে মধ্যে দেখা দেয়-

(v) শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা। (vi) গলা ব্যাথা, (vii) মাথা ব্যথা

(viii) অঙ্গ বিকল হওয়া, (ix) পেটের সমস্যা- হজমে গোলযোগ দেখা দেয়। (x) মুখের স্বাদ ও নাকের ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে যায়।

(xi) কিছু রোগীর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সকল উপসর্গ দেখা গেলেও জ্বর থাকে না।

ইনকিউবেশন পিরিড (রোগের সুপ্তিকাল) ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেতে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এটাকে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ রোগীর লক্ষণ প্রকাশের আগে এই ভাইরাস ব্যক্তির শরীরে এ সময় পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। তবে কিছু কিছু গবেষকের মতে এর ইনকিউবেশন পিরিয়ড ২৪ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। এ ভাইরাস যখন মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়, তখন দ্রুত এক থেকে অন্য বহু মানুষকে সংক্রামিত করে থাকে। তবে এমন ধারণাও করা হচ্ছে যে নিজেরা অসুস্থ না থাকার সময়ও সুস্থ মানুষের দেহে ভাইরাস সংক্রমিত করতে পারে মানুষ।
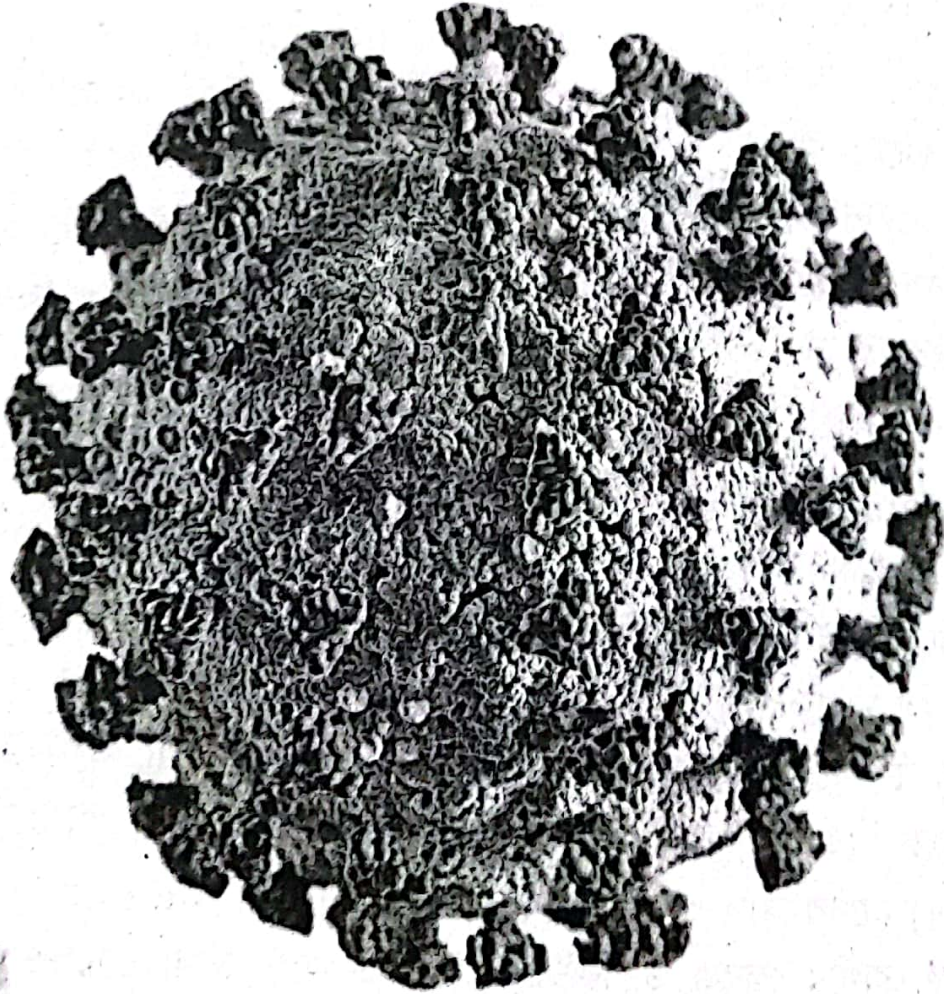
চিত্র ঃ করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)

কোভিড-১৯ ভাইরাস নিম্নলিখিতভাবে ছড়ায় ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশেষজ্ঞদের মতে এটি এক মানুষ হতে অন্য মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়ায়। সংক্রমিত ব্যক্তির শ্বাসতন্ত্রের ফোঁটার (কাশি এবং হাঁচির মাধ্যমে তৈরী) সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে এবং এই ভাইরাস দ্বারা দূষিত অংশ স্পর্শ করার মাধ্যমে এটি সংক্রমিত হয়। কোভিড-১৯ ভাইরাস বেশ কয়েক ঘন্টা ভূপৃষ্ঠে ও যেকোন বস্তু সাথে বেঁচে থাকতে পারে, তবে সাধারণ জীবাণুনাশক এটিকে মেরে ফেলতে সক্ষম।

সঠিকভাবে হাত ধোয়ার অন্যতম উপায় ঃ

ধাপ ১: প্রবাহমান পানিতে হাত ভেজানো,

ধাপ ২: ভেজা হাতে পর্যাপ্ত পরিমান সাবান ব্যবহার করা,

ধাপ ৩: হাতের পেছনের অংশ, আঙ্গুলের মধ্যের অংশ এবং নখের নিচের অংশসহ হাতের সব অংশই অন্ততপক্ষে ২০ সেকেন্ড ভালোভাবে ঘষে ধুয়ে ফেলা,

ধাপ ৪: প্রবাহমান পানিতে ভালভাবে কচলে হাত ধোয়া,

ধাপ ৫: একটি পরিষ্কার কাপড় বা এককভাবে ব্যবহার করেন এমন তোয়ালে দিয়ে হাত ভালোভাবে মুছে ফেলা।

হাত ঘন ঘন ধুতে হবে। বিশেষ করে- খাবার আগে, নাক পরিস্কার করার পর, কাশি বা হাঁচি দেওয়ার পর এবং বাথরুমে যাওয়ার পরেও। সাবান ও পানি যদি সহজে পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ অ্যালকোহল রয়েছে এমন অ্যালকোহলভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। যদি হাতে ময়লা থাকে, তবে সব সময় সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার উপায়সমূহ ঃ

করোনা ভাইরাসসহ সকল ভাইরাস থেকে বাঁচার করণীয়/উপায়সমূহ-

(i) আক্রান্ত ব্যক্তি হতে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরে থাকতে হবে।

(ii) ঘনঘন প্রয়োজনমতো সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা, বিশেষ করে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে কিংবা সংক্রমণস্থলে ভ্রমণ করলে।

(iii) জীবিত অথবা মৃত গৃহপালিত/বন্যপ্রাণী থেকে দূরে থাকা।

(iv) ভ্রমণকারীগণ আক্রান্ত হলে কাশি শিষ্টাচার অনুশীলন করতে হবে (আক্রান্ত ব্যক্তি হতে দূরত্ব বজায় রাখা, হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢেকে রাখা, হাত ধোয়া, যেখানে- সেখানে কফ কাশি না ফেলা)।

(v) করমর্দন এবং কোলাকুলির মাধ্যমেও করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে। এজন্য করমর্দন এবং কোলাকুলির না করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

(vi) সকল ধর্মীয় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এবং কর্মক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

(vii) প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া এবং বের হলে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে।

(viii) মনোবল ঠিক রাখা এবং অন্যকে সুস্থ ব্যবস্থা করতে হবে।

এছাড়াও করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রতিদিন বাড়ি-ঘর ভালো মতো পরিষ্কার করাও জরুরি। তা নিম্নরূপ ঃ

(i) জীবাণুনাশক হ্যান্ডওয়াশ ঃ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঘরে জীবাণুনাশক হ্যান্ডওয়াশ রাখা জরুরি। প্রতিবার খাবার রান্না বা তৈরি করার আগে ও পরে, খাবার খাওয়ার আগে ও পরে, বাথরুম ব্যবহারের আগে ও পরে, বাইরে থেকে বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই জীবাণুনাশক হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধুতে হবে। এসব কাজ ছাড়াও জীবাণুনাশক হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা পড়তে পারে বারবার।

(ii) জীবাণুনাশক ক্লিনিং স্প্রে ঃ

রান্নাঘরের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর রাখতে জীবাণুনাশক ক্লিনিং স্প্রে ব্যবহার জরুরি। খাবার তৈরির আগে ও পরে জীবাণুনাশক ক্লিনিং স্প্রে ব্যবহার করে রান্নাঘর পরিষ্কার করতে হবে। যাতে কোনো রোগজীবাণু খাবারে ঢুকতে না পারে। রান্নাঘর ছাড়াও বাথরুম, ডাইনিং রুম এবং বেডরুমও জীবাণুনাশক ক্লিনিং স্প্রে দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

(iii) রাবার গ্লাভস ঃ

হাড়ি-পাতিল ধোয়া, টয়লেট পরিষ্কার বা ধুলা-ময়লা পরিষ্কার করা মতো গৃহস্থালি কাজের জন্য রাবার গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে।

(iv) বক্সড টিস্যু ঃ

বাড়ির প্রতিটি ঘরে টিস্যু রাখুন। যাতে কাশি বা হাঁচির সময় হাত বাড়ালেই টিস্যু পাওয়া যায়।

(v) ভেজা টিস্যু, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং পকেট টিস্যু ঃ

জীবাণুনাশক ভেজা টিস্যু এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ঘরে বা বাইরেও ব্যবহার করা যায়। যখন সাবান বা পানি পাওয়া যাবে না তখন এসব ব্যবহার করে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

করোনা ভাইরাসের ইনভেস্টিগেশন ঃ

(i) রিয়াল টাইম পিসিআর বা রিয়াল টাইম পলিমারেস চেইন রিএ্যাকশন ঃ গলার ভেতর এবং নাকের গোড়ার কাছ থেকে লালা নিয়ে তা পরীক্ষা করতে হবে।

লালা পরীক্ষা পজেটিভ হলে, পরবর্তীতে আরো পরীক্ষা করতে হবে-

(ii) চেস্ট এক্স-রে,

(iii) ব্লাড কাউন্টিং (সিবিসি) করতে হয়।

করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা ঃ

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

এ রোগের প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার হয় নাই। তাই গণসচেতনতা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থায়ই এর শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা। তারপরেও আক্রান্ত হলে লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা দিতে হবে।

লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা ঃ

যেহেতু করোনা ভাইরাস একটি নতুন ভাইরাস যা পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে লক্ষণ সাদৃশ্যে এর চিকিৎসা করা সর্বত্তোম। বিজ্ঞানী ডা ঃ হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি সুস্থ মানুষের দেহে ঔষধ পরীক্ষা করেন। হোমিওপ্যাথি একটি লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। লক্ষণানুসারে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ- একোনাইট ন্যাপ, বেলেডোনা, আর্সেনিক এলবা, ব্রায়োনিয়া এল্বাম, রাস-টক্স, এন্টিম টার্টারিকাম, কফিয়া, স্পঞ্জিয়া, কেলি বাইক্রোমিকাম, ইপিকাক, নেট্রাম সালফ, ল্যাকেসিস, রিউমেক্স, কার্ব-ভেজ, জেলসিমিয়াম, হিপার সালফ, নাক্স-ভূমিকা, ফসফরাস, কার্ব-এনিমেলিস, লাইকোপডিয়াম, পালসেটিলা, সেনেগা, মার্ক-সল, আর্জেন্টাম নাই, নেট্রাম মিউর, সালফার ইত্যাদি।

হাসপাতালের চিকিৎসা ঃ

শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা দেখা দিলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে। দ্রুত আক্সিজেনের ব্যবস্থাসহ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চিকিৎসা দিতে হবে।